অনীক

এপ্রিল ২০১৪
বর্ষ ৫০ □ সংখ্যা ১০
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় □ ১

ঘটনাপ্রবাহ

ভারত-রাশিয়া পরমাণু চুক্তি □ সমরেশ মিত্র □ ১৪
কৃষিতে নয়া আক্রমণ □ সহদেব মণ্ডল □ ১৫
অন্যায় যারা সহে □ তড়িৎ চৌধুরী □ ১৬

প্রবন্ধ

দক্ষিণ এশিয়া : রাষ্ট্রের আধিপত্য জনগণের সংহতি □ আনু মুহাম্মদ □ ৩
স্বাস্থ্যনীতি, ওষুধ কোম্পানির মুনাফা আর ছাঁটাই □ শুভজিৎ বসাক □ ১৯
জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করা প্রসঙ্গে □ বদরুদ্দীন উমর □ ২১
হকার সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ আইন □ দীপঙ্কর দে □ ২৪
সুলা গায়েন □ মনোহর মৌলি বিশ্বাস □ ৩৫

স্মরণ

পিট সিগার-এর গান □ গণবিষাণ □ ৩৭
স্মরণ : বনবিহারী চক্রবর্তী □ ৪০

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৮৯০২১০৪৯৮৭
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com
কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র : সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)
সম্পাদকমণ্ডলী : **রতন খাসনবিশ**
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব

সম্পাদকীয়

নির্বাচন— আমজনতার মারীচদশা

নির্বাচন চলছে। কীসের নির্বাচন? আগামী পাঁচ বছরের জন্য দেশটা কারা লীজ নেবে, কারা নেবে গণতন্ত্রের ঠিকা, আম-আদমিকে সেটাই ঠিক করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আম-আদমির বাছাই করার পরিসর খুবই সীমাবদ্ধ। ধরেই নেওয়া হয়েছে, বিজেপি কিংবা কংগ্রেস, এই দুই দলই (তাদের তাঁবেদার সহ) দিল্লীর মসনদের হকদার। ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে দেখা যাচ্ছে, ভারতের কুবেরকুল, সংবাদমাধ্যমগুলির সহযোগিতায়, সংঘবদ্ধ ভাবে বিজেপি-র পাল্লা ভারী করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। নরেন্দ্র মোদীর 'গুজরাট মডেল' কর্পোরেট সংস্থাগুলির কাছে এখন পাখির চোখ।

কংগ্রেস দৃশ্যত কিছুটা ব্যাকফুটে। নেহেরু-গান্ধী পরিবারের যে নবীন পুরুষের জিম্মায় কংগ্রেসীরা নির্বাচনী দ্বৈরথে অবতীর্ণ, যোগ্যতার বিচারে তাঁর বংশগত গরিমা যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা নিয়ে কংগ্রেসীদের মধ্যে ততটাই ধন্দ আছে। তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠন নিয়ে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে বাজি ধরেছিলেন, তাতেও সুবিধা করতে পারেন নি। পৃথক রাজ্য গঠনের বিল পাশ হওয়ার পর, কংগ্রেসের সমস্ত পরিকল্পনায় জল ঢেলে, 'তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি (টিআরএস)' কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত গঠন করতে অস্বীকার করেছে। পুরো ফায়দা টিআরএস একাই তুলতে চায়। তৃতীয়ত, দু'দফা ইউপিএ সরকারের প্রধানমন্ত্রীত্ব সত্ত্বেও, মনমোহন সিং-এর নেতৃত্ব প্রসঙ্গে তাঁর নিজের দলেই বিসম্বাদ আছে। বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের শর্ত মতো মনমোহন-চিদাম্বরম কোম্পানী যে দ্রুত গতিতে ভারতের অর্থনীতিকে উদারতার পথে নিয়ে চলেছেন, তাতে জনপ্রিয়তার হারানোর ঝুঁকি নেওয়ার জন্য তাঁদের দলেরই অনেকের বিরাগভাজন হতে হয়েছে। ২০০৯ সালের নির্বাচনে '১০০ দিনের কাজ' প্রকল্প প্রথম ইউপিএ-কে তরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ২০১৪ সালের নির্বাচনে 'খাদ্য সুরক্ষা আইন' কংগ্রেসকে সে গ্যারান্টি দিতে পারবে কিনা, সেটা নিশ্চিত করে এখনই বলা যাচ্ছেনা। গরিব মানুষকে সুলভে চাল-গম দেওয়ার রাজনীতি অনেক অকংগ্রেসী সরকার নিজ নিজ রাজ্যে আগেই চালু করেছে এবং বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে তার ফায়দাও তুলেছে। ফলত কেন্দ্রীয় আইন কংগ্রেসকে কতটা বাড়তি সুযোগ দেবে, সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে।

তবে ইউপিএ সরকারকে চরম বেকায়দায় ফেলেছে ঘুষ সহ অন্যান্য আর্থিক কেলেঙ্কারি। দুর্নীতির প্রশ্নে বিজেপিও পিছিয়ে নেই বা অন্যান্য সংসদীয় দলগুলি যে কলঙ্কমুক্ত, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। 'কমনওয়েলথ গেম' থেকে 'কোলগেট'— হাজার হাজার কোটি টাকার প্রত্যেকটি আর্থিক কেলেঙ্কারিতে ইউপিএ-২ সরকার কলঙ্কিত। কর্ণাটকে বেআইনী লৌহ-আকর পাচারের অভিযোগে ইয়েদুরাপ্পা সরকার (দক্ষিণ ভারতে বিজেপি-র প্রথম সরকার) শুধু বরখাস্ত হয়নি, ২৫০০ কোটি টাকার অকল্পনীয় আর্থিক দুর্নীতির দায়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে জেল খাটতে হয়েছিল। চলতি লোকসভা নির্বাচনে সেই ইয়েদুরাপ্পা কর্ণাটক থেকে বিজেপি প্রার্থী।

দুর্নীতির প্রশ্নে তিতিবিরক্ত মানুষ দিল্লীর বিগত বিধানসভা নির্বাচনে 'আম-আদমি পার্টি (আপ)'-কে সাফল্য এনে দিয়েছিল। লোকসভা নির্বাচনেও

আপ দুর্নীতি-বিরোধী শ্লোগানকে মূলধন করলেও, যে অনিয়ন্ত্রিত নয়া উদারনীতিক অর্থনীতি সাম্প্রতিক দুর্নীতিগুলির উৎস, আপ তার বিরোধিতা করেনি। তাদের ম্যানিফেস্টোতে (২০১৪) আপ যে "globally competitive and high-growth trajectory" উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তার সঙ্গে কংগ্রেস-বিজেপি ঘোষিত আইএমএফ নির্দেশিত উন্নয়নের ফারাক কতটুকু?

মোদীকে ঘিরে দেশী-বিদেশী পুঁজির উৎসাহ প্রদর্শনে অবাক হওয়ার কারণ নেই। তথাকথিত 'গুজরাট মডেল' নরেন্দ্র মোদীর সৌজন্যে বৃহৎ পুঁজির মৃগয়াক্ষেত্র। সিঙ্গুর থেকে ন্যানো কারখানা গুজরাটে তুলে নিয়ে যাওয়াতে পশ্চিমবঙ্গের কিছু লোকজন হায় হায় করতে শুরু করে দিয়েছিল এবং রাতারাতি মোদী-র টিআরপি বেড়ে গিয়েছিল। মোদীকে ভালোবেসে টাটা গুজরাটে যায়নি। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিও তার কোনো প্রেম ছিলনা। টাটাকে মোদী পশ্চিমবঙ্গের থেকে অনেক বেশি দাঁও মারার সুযোগ করে দিয়েছিল বলেই, মোদী টাটার চোখে 'ভালো ম' হয়ে গিয়েছিল। সানন্দ-এ টাটা সিঙ্গুরের তুলনায় ১০০ একর বাড়তি জমি পেয়েছে। প্রতি একরে টাটাকে মোদী সরকার ১২ লক্ষ টাকা ভর্তুকি দিয়েছে। স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ, ট্রান্সফার চার্জ প্রভৃতি কিছুই দিতে হয়নি টাটাকে। এছাড়া মোদী সরকারের তরফে টাটাকে দেওয়া হয়েছিল ৯৫৭০ কোটি টাকা উপঢৌকন।

আদানী-কে অতিরিক্ত দামে বিদ্যুৎ বিক্রি করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। আম্বানী, এসার— কে পায়নি সাহায্য? সাহায্য থেকে শুধু বঞ্চিত হয়েছে গুজরাটের কৃষক এবং গরিব মানুষ। সাধারণ মানুষের পানীয় জল এবং কৃষকের সেচের জল সরবরাহ করা হচ্ছে বাণিজ্যিক এবং বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে। কৃষিজমি বাজেয়াপ্ত করে ধনকুবেররা কুক্ষিগত করছে। মার্কস বর্ণিত পুঁজির আদিম সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া সমানতালে চলছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী মোদী জমানায় ৭১২৭ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। মানব উন্নয়ন সূচকের নিরিখেও গুজরাটের অবস্থান এমন কিছু আহামরি নয়।

এহেন মোদীর সঙ্গে আদানী-আম্বানী-টাটারা, মায় আমেরিকা হাত মেলাবে, সেটা খুবই স্বাভাবিক। মোদীর মধ্যে তারা আগ্রাসী এক নেতাকে খুঁজে পেয়েছে, যে কাঠামোগত সংস্কারের স্বার্থে বেপরোয়া ভূমিকা নিতে পারে। মনমোহন সিং-ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির পছন্দসই মানুষ। কাঠামোগত সংস্কারে তিনিও পিছপা ছিলেন না। কিন্তু পুঁজিবাদ এখন উন্মাদ। শ্রম-নিরাপত্তার সমস্ত বেড়া তারা ভাঙতে চায়। তার জন্য যদি প্রয়োজন হয়, গণহত্যার কারবারিকেও বরণ করতে তাদের দ্বিধা নেই। দ্বিতীয়ত, যে অর্থনৈতিক অনাচার দেশে চলছে, তার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে সামগ্রিক দায়টা বহন করতে হচ্ছে দেশের গরিব এবং প্রান্তবাসী মানুষদের। প্রাকৃতিক সম্পদের লুঠ তাদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম সম্বলটুকুও কেড়ে নিচ্ছে। অপরদিকে আকাশচুম্বী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সংকট মধ্যবিত্ত মানুষকে নিয়ত দগ্ধ করছে। ক্রমাগত বেসরকারিকরণ করার ফলে শিক্ষা, চিকিৎসা সবকিছু সুযোগ সাধারণ মানুষের হাতছাড়া হতে চলেছে। কৃষক ফসলের দাম পায়না, শ্রমিক পায়না ন্যায্য মজুরি। সমাজজীবনে ঘনিয়ে উঠেছে ব্যাপক অসন্তোষ। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে শাসকশ্রেণীকে তাই নয়া কৌশল উদ্ভাবনের কথা ভাবতে হচ্ছে। শহুরে মধ্যবিত্ত, বিশ্বায়নের অর্থনীতি যাদের জীবনে এনে দিয়েছে উল্লেখযোগ্য স্বাচ্ছন্দ্য— মোদীকে তাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে বিশ্বায়নের কাণ্ডারী হিসাবে। অপরদিকে জাতপাত, ধর্মীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ সমাজে শ্রমজীবী মানুষের বিচ্ছিন্নতার সুযোগে শাসকশ্রেণীর অপকৌশলগুলি লাগু করতেও মোদী-বিজেপি রাজনীতি সুবিধা করে দেবে। বিজেপি-কে মদত দেওয়া সাম্রাজ্যবাদের নয়া কৌশল।

শাসকশ্রেণীর তথা সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টা মোকাবিলা করার ক্ষমতা সংসদীয় বামেরা হারিয়েছে। শাসক হিসাবে বিশ্বায়নের অর্থনীতি অনুসরণ তথা বৃহৎ পুঁজিকে মদত এবং বিরোধী আসনে বসে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা— এই দ্বিচারিতায় তারা বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে এবং সবথেকে বেশি মূল্য চোকাতে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতাও সিপিএম-এর নেই কারণ বিশ্বায়নের অলিন্দে ভ্রমণ ব্যতীত সিপিএম এখন অন্যতর পথ গ্রহণে অক্ষম। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন তৃণমূল দলটি 'যখন যেমন তখন তেমন' নীতিতে চলে। অবক্ষয়ী পুঁজিবাদের অধঃপতিত সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে দলটি টিকে আছে।

এই নির্বাচন সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণে কোনো সহায়তা করবে না। যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, শ্রমজীবী মানুষের সুরক্ষা কবচগুলি হাতাতে তারা তৎপর হবে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি সঙ্কোচনের চেষ্টা করবে। কেউই যখন বাঁচাবার নেই, নিজেদের বাঁচবার পথ নিজেদেরকেই খুঁজতে হবে। উপায় কী।

স্মরণ

লাতিন আমেরিকার প্রখ্যাত সাহিত্যিক **গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ** ৮৭ বছর বয়সে মেক্সিকোয় প্রয়াত হয়েছেন। জন্ম তাঁর কলম্বিয়ায় ১৯২৭ সালে। লাতিন আমেরিকার ইতিহাস ও সমাজ জীবন ছিল তাঁর লেখার বিষয়। '১০০ বছরের নিঃসঙ্গতা' উপন্যাসের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। *অনীক* তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে।

দীপংকর চক্রবর্তী স্মারক বক্তৃতা

মানুষের মুক্তির লড়াই-এর কোন সীমানা নাই

দক্ষিণ এশিয়া : রাষ্ট্রের আধিপত্য জনগণের সংহতি

আনু মুহাম্মদ

দীপংকর চক্রবর্তী প্রথম স্মারক বক্তৃতা দিতে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম বাংলাদেশের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মী আনু মুহাম্মদকে। গত ৪ এপ্রিল ২০১৪ কলকাতার ভারত সভাগৃহে তাঁর বক্তৃতা শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। মূল বক্তৃতার পর একটি সমৃদ্ধ প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে। বক্তৃতাটি এখানে প্রকাশ করছি।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

'দীপংকর চক্রবর্তী প্রথম স্মারক বক্তৃতা' প্রদানে আমন্ত্রিত হয়ে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। এই দায়িত্ব আমার জন্য একই সঙ্গে গৌরবের এবং শোকের। এই বক্তৃতা আমি দীপংকরদার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে রাখতে চাই।

দীপংকরদার সাথে আমার প্রথম দেখা ঢাকায় একুশে বই মেলায়, সম্ভবত ১৯৮৩ বা ৮৪ সালে। সর্বশেষ কলকাতায় দেখা হয়েছে ২০১২ সালের মার্চ মাসে। দীপংকর চক্রবর্তীর সাথে পরিচয়ের অনেক আগে থেকেই তাঁর সম্পাদিত *অনীক* পত্রিকার কথা জানি। ভারতের মানুষের ভিন্ন চিন্তা ও লড়াই নিয়ে জানতে যেসব পত্রিকার ওপর আমরা নির্ভর করি বাংলাভাষায় প্রকাশিত *অনীক* তার মধ্যে অন্যতম। বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে *অনীক* নামের এই পত্রিকা দীর্ঘসময় ধরে প্রকাশনা অব্যাহত রাখা এক বিস্ময়। দীপংকর চক্রবর্তী ও তাঁর সহযোদ্ধারা যে এই অসম্ভব কাজ সম্ভব করেছেন তার জন্য আমরা অনুপ্রাণিত বোধ করি। মানুষের মুক্তির লড়াইয়ের কোন সীমানা নাই, এই দৃষ্টিভঙ্গি দীপংকরদার মধ্যেও জাগ্রত ছিলো। সেজন্য ভারতের *অনীক* পত্রিকার পাঠকের কাছে বাংলাদেশের মানুষের চিন্তা ও লড়াইয়ের খবর পৌঁছে দিতে তিনি সবসময়ই সচেষ্ট ছিলেন।[১]

মানুষের মুক্তির চিন্তা ও লড়াইয়ের মধ্যে দীপংকর চক্রবর্তী বেঁচে থাকবেন।

দক্ষিণ এশিয়া : উন্নয়ন ও বঞ্চনার কাহিনী

ঐতিহাসিক সম্পর্ক, ভৌগোলিক অবস্থান এবং বর্তমান বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরাম বিবেচনায় আমি দক্ষিণ এশিয়া বলতে আফগানিস্থান থেকে মায়ানমার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল বুঝিয়েছি। এই দুটি প্রান্ত দেশ ছাড়া এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত অন্য দেশগুলো হল ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, ভুটান ও বাংলাদেশ। '৮০ দশকের মাঝামাঝি বাংলাদেশের উদ্যোগে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, ভুটান ও বাংলাদেশ নিয়ে 'দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা জোট' বা *সার্ক* গঠন করা হয়। সম্প্রতি একে সম্প্রসারণ করে আফগানিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই জোটে মায়ানমারকেও পর্যবেক্ষক হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সীমা নিয়ে বিভিন্ন মত আছে। এই সীমা নির্ধারণ বিতর্ক আপাতত আমাদের আলোচনার জন্য ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা গুরুত্বপূর্ণ এর ধারণাগত বিষয়।

মুঘল আমলে এই দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ অংশ অখণ্ড ভারত হিসেবে চিহ্নিত ছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের পরে ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে বর্তমানের বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত এই তিনটিই অন্তর্ভুক্তই ছিল। সেই হিসেবে সাংস্কৃতিকভাবে এই তিনটি দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের পারস্পরিক যোগাযোগ আছে। কিন্তু এটিও একটি লক্ষণীয় বিষয় যে, খুব কাছাকাছি অন্যান্য যেসব দেশ আছে যেমন শ্রীলংকা, তার সাথে বাংলাদেশের ভাষাগত, সাংস্কৃতিক কিংবা বাণিজ্যিক যোগাযোগ তুলনায় অনেক কম, নেপালের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ একটি সম্পর্ক হওয়া সম্ভব, কিন্তু তা এখনও দুর্বল প্রধানত ভারতের কারণেই। ভুটান বা মালদ্বীপের সাথেও সম্পর্ক খুব সবল নয়। আর খুব কাছে হলেও মায়ানমার বা আফগানিস্তান এখনও বাংলাদেশের জন্য বেশ দূরের দেশ।

দেড়শো কোটিরও বেশি মানুষের বাস এই দক্ষিণ এশিয়ায়। যেসব বহুল প্রচলিত মাপকাঠি ব্যবহার করা হয় উন্নয়ন মাপার জন্য, তার কয়েকটিতে বেশ সন্তোষজনক চেহারাই দেখা যায় অঞ্চলের। বিশ্বের গড় হার বিবেচনায় এই অঞ্চলের দেশগুলোর প্রবৃদ্ধির হার ভালো, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিরাপদ, মুদ্রাস্ফীতি আয়ত্তের মধ্যে, বিশ্ব অর্থনীতির সাথে যোগাযোগ ভালো, সবগুলো অর্থনীতিই আমদানি রপ্তানি উদারীকরণে এগিয়ে, বিনিয়োগ হার ভালো ইত্যাদি ইত্যাদি। তাছাড়া উর্বর জমি, মৎস্য সম্পদ, পানি সম্পদ, খনিজ সম্পদ, ভূবৈচিত্র্য, সমুদ্রসম্পদ, প্রাণবৈচিত্র্য, ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ইত্যাদি সবদিক থেকেই এই অঞ্চল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। 'উন্নয়ন'-এর নামে মুনাফা উন্মাদনার আগ্রাসনে অনেক ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও এখনও জীবন ও প্রকৃতির বিকশিত অবস্থা তৈরি সম্ভব।

কিন্তু তারপরও পুরো দক্ষিণ এশিয়া এখন বিশ্বের চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শতকরা প্রায় অর্ধেক মানুষের অঞ্চল, বিশ্বের সবচাইতে বেশি গরীব মানুষ কেন্দ্রীভূত এই অঞ্চলে। জাতিসংঘের 'বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক' (Multidimensional

Poverty Index) অনুযায়ী বিশ্বের দরিদ্রদের এক চতুর্থাংশ আফ্রিকায় বাস করেন, আর অর্ধেক বাস করেন দক্ষিণ এশিয়ায়। এই সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে, আফ্রিকার ২৬টি দরিদ্রতম দেশের চাইতে বেশি সংখ্যক দরিদ্র মানুষ ভারতের ৮টি রাজ্যে বাস করে। বলা হয়, এই সূচক অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার দরিদ্র মানুষের অনুপাত ৫৫।[২] যদি দিন প্রতি আয় ২ ডলার ধরে দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়, তাহলে জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী এই অঞ্চলের শতকরা ৭৭ জন মানুষই দারিদ্র্যসীমার নীচে। বিশুদ্ধ পানি, শিক্ষা, চিকিৎসা, আশ্রয় সবগুলোতেই এসব দেশের বেশিরভাগ মানুষ বিপন্ন অবস্থায় আছেন। শ্রেণীগত, জাতিগত, লিঙ্গীয়, ধর্মীয়, বর্ণগত বৈষম্য নিপীড়নে ক্ষতবিক্ষত শতকোটি মানুষ। প্রচলিত মানব উন্নয়ন সূচক বিবেচনা করলে শ্রীলংকা ছাড়া সবগুলো দেশই ১২০-এর পরে।

কমপক্ষে ৪২ কোটি মানুষ দিনে ১ ডলারেরও কম আয় করেন, মাথাপিছু শস্য প্রাপ্তি কিছুটা বাড়লেও বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষের শতকরা ৪০ ভাগ মানুষের বাস এই অঞ্চলে। বিশ্বের সবচাইতে বেশি সংখ্যক অপুষ্ট মানুষ এই অঞ্চলে বাস করেন। ৫ বছরের কমবয়সী শিশুদের শতকরা ৪৫ ভাগ চরম অপুষ্টিতে ভোগে। শ্রীলংকা ছাড়া বাকি সব দেশেই এই হার অনেক উঁচু, ভারতে সর্বোচ্চ।

শ্রেণী ও লিঙ্গীয় বৈষম্য নিপীড়নে সবগুলো দেশেই কমবেশি একই চিত্র। এছাড়াও ভারতে বিশেষভাবে বর্ণ ও জাতিগত বৈষম্য ও নিপীড়ন, পাকিস্তানে শিয়া-সুন্নী-আহমদিয়া, বাংলাদেশে জাতিগত নিপীড়ন, শ্রীলংকায় জাতিগত নিপীড়ন ও সংঘাত এবং এই সবগুলো দেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গত কয়েক দশকে, বিশেষত '৯০-এর দশকের পর সবগুলো দেশেই জাতিবিদ্বেষী, সাম্প্রদায়িক-ধর্মীয় ফ্যাসিবাসী শক্তির উত্থান ঘটেছে। নেপালে মাওবাদী সশস্ত্র সংগ্রামের একপর্যায়ে সাফল্য সত্ত্বেও পুরো অঞ্চলে বাম প্রগতিশীল আন্দোলন সংগঠনে দুর্বলতার দিকটিই প্রধান।

গত কয়েক দশকের উন্নয়ন ধারায় এই দেশগুলোতে খুবই ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে বিপুল ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি, নির্লজ্জ মাত্রার ভোগবিলাস, চোরাই অর্থনীতির দাপট বেড়েছে। ভারত ও পাকিস্তানে শুধু যুদ্ধ উন্মাদনাতেই বিপুল সম্পদ ব্যয় হয়। দুটো দেশের শাসকেরাই দারিদ্র্য নিরক্ষতা বঞ্চনা ভরা দেশে বিপুল অর্থব্যয়ে ভয়ঙ্কর পারমাণবিক বোমা বানিয়ে গর্বিত এবং জনগণের মধ্যে এ গর্ব উন্মাদনা ছড়ানোতে তৎপর। সিপ্রি-র সংকলিত তথ্য অনুযায়ী, ভারত বর্তমান বিশ্বের সর্ববৃহৎ অস্ত্র আমদানিকারক এবং পাকিস্তান তৃতীয় বৃহত্তম। দারিদ্র্যের পাশাপাশি ঐশ্বর্যের আর ধ্বংস উন্মাদনার এরকম অশ্লীল সহাবস্থান খুব কম অঞ্চলেই আছে।

দারিদ্র্য বঞ্চনার কদর্য চেহারা আর প্রাচুর্যের জৌলুস; মুক্ত চিন্তার পাশাপাশি উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি; ক্রমবিস্তারমান বিরাজনীতিকৃত মধ্যবিত্তের পাশে বিভিন্ন প্রান্তে অপমানিত বঞ্চিত কোটি মানুষের অদম্য লড়াই; গণতন্ত্রের চর্চার পাশাপাশি নিপীড়নের বর্বরতা ও ক্রমবর্ধমান সামরিকীকরণ ইত্যাদি বৈপরীত্য নিয়েই দক্ষিণ এশিয়া।

ভিন্ন রাষ্ট্র : অভিন্ন যাত্রা

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিদায়ের সময় এই উপমহাদেশে দীর্ঘস্থায়ী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং দেশভাগের রক্তাক্ত অধ্যায় তৈরি করে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। এভাবে দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিত, তার জন্য দায়ী রাজনীতি ও মানবিক বিপর্যয় নিয়ে অসংখ্য লেখা, গান, চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। বিতর্ক এখনও চলছে। আর এখনও এর বোঝা টানছে এই অঞ্চলের মানুষ। 'স্বাধীনতা' অর্জনের পর ভারত সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে সক্ষম হলেও পাকিস্তান প্রথম থেকেই শাসন সংকটে পতিত হয় এবং অচিরেই সামরিক শাসনের কবলে পড়ে। ১৯৭১ সালে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হলেও ৩ বছরের মাথায় আবার সামরিক শাসনে আটকে যায়। '৭০ দশকের শুরুতেই বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান সমাজতন্ত্র, রাষ্ট্রীয়করণ, গরিবি হঠাও ইত্যাদি শ্লোগান দ্বারা ভারাক্রান্ত ছিল। তিন দেশেই এইসময়ে নেতৃত্ব দেন এযাবৎকালের স্ব স্ব দেশে সবচাইতে জনপ্রিয় তিন নেতা, শেখ মুজিব, ইন্দিরা গান্ধী এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো। সোভিয়েত ইউনিয়নের অ-ধনবাদী বিকাশ তত্ত্ব দ্বারা সমর্থিত হয়ে অনেক জনতুষ্টিমূলক কথা উচ্চারণ করলেও, ঘোষিত লক্ষ্য ও রাজনীতির বৈপরীত্যের কারণে, এদের ব্যর্থতা ছিলো অনিবার্য এবং করুণ। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে একদলীয় শাসন চালু হয়, ১৯৭৫ সালে ভারতে জরুরি অবস্থা জারী হয়। তিন নেতাই কয়েকবছরের ব্যবধানে নিহত হন। শেখ মুজিব ও ভুট্টোর নিহত হবার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান দীর্ঘমেয়াদী সামরিক শাসনে প্রবেশ করে।[৩]

'৮০ দশকে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশে জেনারেল এরশাদ ও পাকিস্তানে জেনারেল জিয়াউল হকের নেতৃত্বে সামরিক শাসন খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করে। দুদেশেই রাজনীতির ইসলামীকরণ ও বিশ্বপুঁজির স্বপক্ষে অর্থনীতির উন্মুক্তকরণ একই সঙ্গে চলতে থাকে। ভারতে একই সংস্কার শুরু হয় '৯০ দশকের শুরুতে, ভারতেও হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রসার তখন থেকেই। পুঁজির আগ্রাসন ও ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী শক্তির সমান্তরাল বিস্তার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিদ্যমান উন্নয়ন দর্শন, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন ও সংস্কারের সাথে সাথে এসব শক্তির বিস্তার ঘটায় অর্থনৈতিক নীতিদর্শন থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই

সমস্যা যথাযথভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচাইতে দীর্ঘসময় সামরিক শাসন চলে মায়ানমারে। এই সামরিক শাসনকালে পশ্চিম বিশ্বের অবরোধের কথা শোনা গেলেও খনিজসম্পদমুখি বহুজাতিক পুঁজির বিনিয়োগ অব্যাহতই। নেপালে ছিলো রাজতন্ত্র, মাওবাদীদের সশস্ত্র সংগ্রামের দৃষ্টিগ্রাহ্য ফলাফল রাজতন্ত্রের পতন। অর্থনীতিতে ভিন্ন কোন যাত্রা সম্ভব করবার মতো রাজনৈতিক পরিবর্তন এখনও দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। আফগানিস্তান কার্যত মার্কিন দখলে আছে। বিশ্বজুড়ে ইসলামপন্থীদের নিজেদের রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে একসময় ব্যবহার, অন্যসময়ে তাদের সন্ত্রাসী পরিচয় দিয়ে বিশ্বব্যাপী নিজেদের দখল নিশ্চিত করবার মার্কিন কৌশল খেলার জন্য আফগানিস্তান সবসময়ই বিশেষ মনোযোগ দাবি করে।[৪] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বিশ্ব দখলদারিত্বের নতুন আওয়াজ 'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ' এই আফগানিস্তান ধরেই শুরু হয়, যে অভিযান পাকিস্তানের মাধ্যমেই কার্যকর হয়। ক্রমে ভারত, বাংলাদেশও এই মডেল গ্রহণ করে।

এই অঞ্চলে মায়ানমার ছাড়া আর কোন দেশেই এখন প্রত্যক্ষ সামরিক শাসন নেই কিন্তু সব দেশেই সামরিকীকরণ বেড়েছে। প্রায় সবগুলো দেশেই নির্বাচিত সরকারের অধীনে একের পর এক 'নিরাপত্তা আইন', 'নিরাপত্তা ব্যবস্থা' আর দমনমূলক নানা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ দেখা যাচ্ছে।

পুরো দক্ষিণ এশিয়ায় উন্নয়ন ও মূলধন সংবর্ধনের ধরন, বিশ্ব পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের সাথে তার যুক্ততা, কর্পোরেট স্বার্থে মানুষ ও প্রকৃতি বিরোধী আগ্রাসন ইত্যাদিতে রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের ঐক্য আছে। ঐক্য আছে নিপীড়নমুখী রাষ্ট্রের শক্তিবৃদ্ধির অবিরাম চেষ্টায়। মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় কমবেশি অঙ্গীভূত সবগুলো দেশই। 'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ' এখন সব দেশের শাসকদেরই নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিস্তারের প্রিয় কৌশলসূত্র।

অর্থনৈতিক সংস্কারের গতিমুখ

বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় মূলধন সংবর্ধন প্রক্রিয়া সংগঠনে দখল অপরাধ সন্ত্রাস খুবই শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে। মার্কসের 'মূলধনের আদিম সংবর্ধন' (primitive capital accumulation) ধারণা তাই বর্তমান সময়েও খুবই প্রাসঙ্গিক দেখা যাচ্ছে। বর্তমান বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারনার পুনঃসূত্রায়ন করেছেন ডেভিড হার্ভে 'উচ্ছেদের মাধ্যমে সংবর্ধন' (accumulation by dispossession) নামে। ভারত ও বাংলাদেশে পুঁজির আগ্রাসনের এই রূপ তৈরি করছে নতুন ছিন্নমূল মানুষ, সাধারণ সম্পত্তির ব্যক্তিকরণ, বন ও পরিবেশ বিপর্যয়, নদীবিনাশ এবং দীর্ঘমেয়াদে জনবিপন্নতা।[৫]

নয়া উদারতাবাদী (বা নয়া সংরক্ষণবাদী) দর্শন অনুযায়ী বিশ্বব্যাংক আইএমএফ এডিবির 'সংস্কার কর্মসূচি'র সারকথাই হলো জগতের সকল ক্ষেত্রকে পুঁজির অধীনস্ত করা, শিক্ষা, চিকিৎসা, পানিসহ সর্বজনের সবকিছু বাণিজ্যিকীকরণ করা। নদী নালা খালবিল পাহাড় বন জঙ্গল সহ সর্বজনের সম্পত্তি ব্যক্তির মালিকানায় বা নিয়ন্ত্রণে মুনাফামুখী তৎপরতায় নিযুক্ত করা। এই ধারাতেই বিরাষ্ট্রীয়করণ, বিদেশি বিনিয়োগ সহজীকরণ এবং বাণিজ্য উদারীকরণ। '৮০ দশক থেকে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে এবং '৯০ দশক থেকে ভারতে এই উন্নয়ন ধারা অনেক জৌলুস তৈরি করেছে আর ভীড় বেড়েছে উন্মূল মানুষের। বাংলাদেশে এসব সংস্কার রপ্তানিমুখী খাতের বিকাশ ঘটিয়েছে কিন্তু বাংলাদেশে বৃহৎ ও মৌলিক শিল্পভিত্তি ও তার সম্ভাবনা ধ্বংস করেছে, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধির বদলে তা তছনছ করেছে, দেশকে আমদানিমুখী করেছে, উৎপাদনমুখীতা থেকে দোকানদারি অর্থনীতির প্রসার ঘটিয়েছে, শিক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রকে বাজারের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। সবদেশেই চোরাই কোটিপতি আর দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়েছে।

অর্থনীতির এই সংস্কারের ধরনে সবচাইতে লাভবান হয়েছে ভারতের বৃহৎ পুঁজি। ভারতের বৃহৎ পুঁজির ক্রমবর্ধমান আধিপত্য তাই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংস্কার বা বিদ্যমান উন্নয়ন ধারার অবধারিত ফলাফল।

রাষ্ট্র নির্দেশিত পুঁজিবাদ বিকাশে ভারত একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতার পর কয়েক দশকে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পিত উন্নয়ন ধারায় ভারতে একটি শক্ত শিল্পভিত্তি নির্মিত হয়। কিন্তু পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ বিকাশ গতি অনুযায়ী শিল্পখাত ও দক্ষ জনশক্তির বিস্তার খুবই অসম এবং ভারসাম্যহীন— অঞ্চলগত এবং খাতওয়ারি দুভাবেই। সোভিয়েত সমর্থনে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ভারতে পুঁজিবাদের বিকাশ একপর্যায়ে বেসরকারি খাতে একচেটিয়া গোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব করেছে।[৬] পুঁজির পুঞ্জীভবনের অনিবার্য প্রক্রিয়ায় ভারত রাষ্ট্র ক্রমে একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলোর প্রধান বাহনে পরিণত হয়েছে। ভারতের বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী যখন সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ওপর দখল এনেছে তখন একই সঙ্গে দুর্বল প্রযুক্তি নির্ভর ক্ষুদ্রশিল্পে আটকে আছে বিশাল জনগোষ্ঠী। কৃষিখাতের একদিকে যখন বাণিজ্যিকীকরণ ঘটে, উচ্চ প্রযুক্তির ব্যবহার চলে, অন্যদিকে খরা বন্যা সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জেনেটিক প্রযুক্তির আগ্রাসনে বিপর্যস্ত হন বিশাল সংখ্যক কৃষক। পানি আর বন, জমি আর জনজীবন সবই এখন মুনাফার সন্ধানে পুঁজির নির্বিচার আগ্রাসনের মুখে, দেশি বিদেশি একাকার।

ভারতের এই সংস্কার ধারার প্রধান চালিকা শক্তি এই দেশের ভেতরের বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসায়িক গোষ্ঠী। কেননা, এর মধ্য দিয়ে অর্থনীতির উপর বৃহৎ বেসরকারি শিল্প ও ব্যবসায়িক

গোষ্ঠীর আধিপত্যই সম্প্রসারিত হয়। তবে আমদানি উদারিকরণ ক্ষেত্রে তাদের দিক থেকে প্রতিরোধও ছিল। তার ফলে আমদানি উদারিকরণ বাংলাদেশ যেভাবে নির্বিচার আমদানি বৃদ্ধির পথ নিয়েছে, ভারত সেরকম উৎসাহ দেখায়নি। বরঞ্চ বাংলাদেশের নির্বিচার আমদানি পথ ভারতের এসব শিল্পগোষ্ঠীর জন্য সুবিধাজনক হয়েছে।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ভেঙেচুরে বিলিয়ে দেয়া বা নষ্ট করা যেখানে সরকারের বরাবরের নীতি সেখানে ভারতে '৯০ দশকে এসব সংস্কারের সময়ও কিছু রাষ্ট্রীয় খাত গুরুত্বের সঙ্গে রক্ষা করা হয়। এসময়ে ভারত সরকার ১১টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানকে নবরত্ন হিসেবে ঘোষণা করে সেগুলোর নবায়ন ও স্বায়ত্তশাসন নিয়ে সম্প্রসারণের কর্মসূচি নেয়। এগুলোকে নিজেদের বিনিয়োগ, যৌথ বিনিয়োগ ও অন্য দেশে সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিনিয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়। বাংলাদেশে নানা পশ্চিমা বিনিয়োগেও সহযোগী হিসেবে এখন এসব প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলোর নাম শোনা যায়।

ভারতে নতুনভাবে বিন্যস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত খাত, বেসরকারি খাত, যৌথ বিনিয়োগ, একক বিদেশি বিনিয়োগ সবগুলো মিলিয়ে ভারতে দেশি বৃহৎ পুঁজি, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত পুঁজি ও বহুজাতিক পুঁজির যে মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে তার সংবর্ধন, পুঞ্জীভবন এবং সম্প্রসারণের অনেক বেশি চাপ। চারপাশের দুর্বল শিল্পগুলো অতএব তার সুবিধাজনক ক্ষেত্র। এর সাথে খুব সঙ্গতিপূর্ণভাবেই ভারতের সামরিক চিন্তা পুনর্বিন্যস্ত হচ্ছে, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ বা এডিবির প্রস্তাবনা বা সুপারিশমালাতে স্পষ্টই বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থার প্রবেশাধিকার সহজ করবার ব্যবস্থাই থাকে। এখন এই ক্ষেত্রে ভারতকেন্দ্রিক বিভিন্ন সংস্থার প্রতি তাদের পরিষ্কার ঝোঁক বোঝা যায়। কারণ এগুলো এখন আর নিছক ভারতীয় বিনিয়োগ নয়, বহুজাতিক বিনিয়োগের বিভিন্ন রূপ।

এসব সংস্থার মধ্যে ভারতের প্রভাব আমরা বাংলাদেশে প্রতিনিয়তই টের পাই। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে ভারতের এই প্রভাব সেখানকার (ভারতের) জনগণের পক্ষে যায়। এসব সংস্থার নানা প্রকল্পের ভারে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের জীবনও এখন বিপর্যস্ত। কৃষি, বন, নদী, পানি, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক, এডিবি সমর্থিত বিভিন্ন প্রকল্প জনগণের সম্পদ বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের আয়োজন করেছে। এসব প্রকল্প ভারতের মানুষকে ছাপিয়ে এখন প্রতিবেশী দেশগুলোর জন্যও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের জন্য ফরাক্কা বাঁধ সবসময়ই একটি মরণ ফাঁদ, আর এর সঙ্গে এখন প্রস্তুতি চলছে টিপাইমুখ বাঁধ এবং আরও ভয়ঙ্কর নদী সংযোগ প্রকল্পের। বাংলাদেশ অংশে তিস্তা নদী এখন মরণাপন্ন। ব্রহ্মপুত্র নদীতে বাঁধ দেবার চীনা পরিকল্পনা ভারত ও বাংলাদেশ দুদেশের জন্যই হুমকি হয়ে উঠেছে।

প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগের বিশাল অংক বেকারত্বের কোন সুরাহা দেখাতে সক্ষম হয়নি। অরুন্ধতী রায় ভারত প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা দক্ষিণ এশিয়ার সবদেশের জন্যই প্রযোজ্য— ''কোটি কোটি মানুষের জমি দখল করে রাষ্ট্র তা 'জনস্বার্থে' তুলে দিচ্ছে বৃহৎ কর্পোরেশনগুলোর হাতে। ২০ বছরের বিশাল প্রবৃদ্ধির পর ভারতের মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৬০ ভাগ আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেঁচে আছে। শতকরা ৯০ ভাগ শ্রমিক কাজ করছে অসংগঠিত খাতে।''[৭]

অন্যদিকে এই সময়কালেই প্রায় সবগুলো দেশে প্রবাসী আয়ের উর্ধ্বগতি দেখা যায়। ২০০০ সালে বাংলাদেশে প্রবাসী অর্থের পরিমাণ ছিলো জিডিপির শতকরা ৪ ভাগ, এখন তা শতকরা ১৪ ভাগ। পাকিস্তানে এই হার শতকরা ১ থেকে বেড়ে ৫ ভাগ। অনুপাতে নেপালে অনেক বেড়েছে, জিডিপি-র শতকরা ২ ভাগে থেকে শতকরা ২৩ ভাগের বেশি। শ্রীলংকায় শতকরা ৭ থেকে ৮ ভাগ, ভারতে শতকরা ৩ থেকে বেড়ে ৪ ভাগ। আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি এই দুটো দেশে কম হলেও মোট পরিমাণে তা অনেক বেড়েছে। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী ভারতে ১৯৯০-৯১ সালে প্রবাসী আয় ছিলো ২.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০০০ সালে ছিলো ১২.৮৫ বিলিয়ন ডলার, ২০১৩ সালে ৭১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৮] বাংলাদেশে শিল্পখাতে যে সংখ্যক শ্রমিক কাজ করেন তার চাইতে অধিকসংখ্যক প্রবাসে কাজ করেন বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক হিসেবে। প্রবাসী শ্রমিকদের মানবেতর জীবনের বিনিময়ে এই দেশগুলো যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে তা একদিকে এসব দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে বড় ধ্বংস থেকে উদ্ধার করেছে, অন্যদিকে বিশাল বেকার জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপ থেকে দেশের অর্থনীতিকে অনেকখানি মুক্ত করেছে। বস্তুত উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি ও তার আত্মসাতের বিস্তৃতিই ঘটেছে তার মাধ্যমে।

বিদ্যমান অধিপতি উন্নয়ন দর্শনে দারিদ্র্য বিমোচনে এনজিও এবং ক্ষুদ্র ঋণ বিশেষ স্থান দখল করেছে। বাংলাদেশ বৃহত্তম এনজিও-র (ব্র্যাক) দেশ, এটি একইসঙ্গে বৃহত্তম ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থার (গ্রামীণ ব্যাংক) দেশ। এই হিসেবে দারিদ্র্য বিমোচনে বিশ্বে তো বটেই দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশের সাফল্য থাকবার কথা সবচাইতে বেশি। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারেরই প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্যে দেখা যাচ্ছে, দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের অনুপাত বাংলাদেশেই সবচাইতে বেশি। বাংলাদেশে যেখানে দাবি করা হচ্ছে শতকরা ৩১.৫ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছেন, সেখানে একই মাপকাঠিতে

ভারতে এই হার ২৯.৮, নেপাল ২৫.২, ভূটান ২৩.২, পাকিস্তান ২২.৩, শ্রীলংকা ৮.৯।[৯]

পরাশক্তি ভারত : উন্নয়নের ধরন

জনসংখ্যা, আয়তন, সম্পদ সবদিক থেকে ভারত এই অঞ্চলে সর্ববৃহৎ। সামরিক ও অর্থনৈতিক সবদিক থেকেই এটি বিশাল শক্তি এবং আশেপাশের দেশগুলোর সাথে তার তুলনাও চলে না। অন্যদিকে এই ভারতে যে সংখ্যক দরিদ্র মানুষ বাস করে তা বিশ্বের আর কোন দেশে করে না।

ভারত প্রসঙ্গে অরুন্ধতী রায় ২০০১ থেকে শুরু করে এই শতকের প্রথম দশকের প্রবণতার সারসংক্ষেপ করেছেন এই বলে যে, এই দশক ‘‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আবার বিশ্বসভায় অর্থনৈতিক ও পারমাণবিক শক্তি হিসেবে ভারতের আবির্ভাবকাল। এই বছরগুলো কারও কারও জন্য অভাবনীয় সম্পদ ও সমৃদ্ধি এনেছে, অন্যদের জন্য তা এমন দুঃস্থতা, অনাহার, এমন হতাশা এনেছে যে তাদের জীবনকে আর মনুষ্যজীবন বলা যায় না। গুজরাটের মুসলমানদের জন্য তা এনেছে গণহত্যা। ভারতের মুসলমানদের জন্য হিন্দু ফ্যাসিবাদের ভূত। লক্ষাধিক কৃষকের জন্য তা এনেছে আত্মহত্যা। কর্পোরেশনগুলির জন্য এই সময় দিয়েছে বিপুল মুনাফা। দান্তেওয়াড়ার আদিবাসীর জন্য এই বছরগুলো এনেছে বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ এবং সরকারি নিষ্ঠুর গৃহযুদ্ধ। কাশ্মীর, মণিপুর ও নাগাল্যান্ডের মানুষের জন্য তা এনেছে ‘স্বাভাবিকতা’র নামে অবিরাম সামরিক দখলদারিত্ব।’’[১০]

অরুন্ধতী রায় ভারতের শাসন শ্রেণী সম্পর্কে যা বলেছেন তা পাকিস্তান সম্পর্কেও প্রযোজ্য, যারা ‘‘এক হাতে দেশ বিক্রি করছে পশ্চিমা বহুজাতিক পুঁজির কাছে, অন্যদিকে দেশের পারমাণবিক বোমা সীমান্ত রক্ষার কথা বলছে। একদিকে বলছে বিশ্ব হচ্ছে একটি গ্রাম, অন্যদিকে জন্য পারমাণবিক অস্ত্র বানানোর জন্য শত হাজার কোটি টাকা খরচ করছে।’’[১১]

ভারত সরকারের জরিপ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের গ্রামীণ পরিবারের শতকরা ৬০ ভাগের কোনো ল্যাট্রিন নেই, পান করবার পানি আনতে গ্রামের শতকরা ৫০ ভাগ মানুষকে কমপক্ষে আধাকিমি পর্যন্ত হাঁটতে হয়। শহরের শতকরা ১১ ভাগ মানুষ বস্তিতে থাকেন। আন্তঃরাজ্য পার্থক্য খুবই উচ্চ মাত্রার। কেরালার যেখানে শতকরা ৯২.৭ ভাগ মানুষ ল্যাট্রিনের সুবিধা পান, ঝাড়খন্ডে এই সুবিধা পান শতকরা মাত্র ৭.৫ ভাগ। বিদ্যুৎ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। গ্রামে শতকরা ৮০ ভাগ ও শহরে শতকরা ৯৮ ভাগ এখন বিদ্যুতের আওতায়। গড়ে ভারতের গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৯৪ জন এবং শহরে শতকরা ৭১ জনের বসবাসের নিশ্চিত ব্যবস্থা আছে। তবে রাজ্য ভেদে এর হারে অনেক তফাৎ দেখা যায়। কেরালার শহরে ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চসংখ্যক মানুষের বাসের ব্যবস্থা আছে (শতকরা ৯০.২ ভাগ), অন্ধ্রপ্রদেশে সর্বনিম্ন (শতকরা ৫৪.৮ ভাগ)। তবে গড়ে ভারতের গ্রামের শতকরা মাত্র ২৬.৩ জনের ঘরে প্রয়োজনীয় আলোবাতাস আছে, শহরে এই হার শতকরা ৪৭.১ ভাগ।[১২]

ভারতে প্রতি বছর অসংখ্য কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। গত ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করেছে। বৈশ্বিক বহুজাতিক কোম্পানির আধিপত্য বিস্তার, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতির কারণে কৃষকদের ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া এবং ফলশ্রুতিতে এই আত্মহত্যা। বিশাল সম্পদশালী দেশ অথচ প্রতিবছর কৃষকদের আত্মহত্যার এই প্রবণতা বাড়ছেই।

দক্ষিণ এশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে খুবই নাজুক পরিস্থিতিতে বাস করেন তা ২০০৭-০৮ সময়কালে বিশ্ব অর্থনীতির সংকটে খাদ্যের দামবৃদ্ধিতে আরও স্পষ্ট হয়। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, দক্ষিণ এশিয়ার গ্রামীণ মানুষদের শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ খাদ্যের নীট ক্রেতা। তার ফলে খাদ্যের দামবৃদ্ধি দারিদ্র্য পরিস্থিতিতে প্রত্যক্ষ অবনতির কারণ হয়।[১৩]

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ফাও-ওবিওএফপি) সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০০৭-৮ সময়কালে চালের দামবৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা হারিয়েছেন কমপক্ষে ৭৫ লক্ষ। এর ফলে ২০০৮ সালে বাংলাদেশে খাদ্যনিরাপত্তাহীন জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি ৫৩ লক্ষ। একই সমীক্ষার হিসাবে বাংলাদেশে উচ্চ দারিদ্র্য সীমার (দিনপ্রতি খাদ্যগ্রহণ ২১২২ কিলো ক্যালরির কম) নীচে বাস রত জনগণের শতকরা হার ৪৫।[১৪] বাংলাদেশের ৫৭ জেলার ৬২ গ্রামে পরিচালিত এক সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, খাদ্যের দামবৃদ্ধির কারণে ২০০৪ সালে দারিদ্র্যসীমার নীচের শতকরা ৪৩.৩ ভাগ মানুষের সংখ্যা বেড়ে ২০০৭ সালে শতকরা ৪৬.৯ ভাগে উঠে।[১৫]

অথচ সরকার দাবি করছে এই সময়ে বাংলাদেশে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। ভারতের সরকারও একইরকম দাবি করেছে। ভারতের প্রবীণ শিক্ষক ও গবেষক উৎসা পট্টনায়েক ভারতের দারিদ্র্য হ্রাসের সরকারি দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিস্তৃত বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন প্রকৃতপক্ষে ২০০৪-৫ তুলনায় ২০০৯-১০ এ দারিদ্র্য পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে।[১৬] উৎসা আরও বলেছেন, ‘‘ইতিমধ্যে ভারতের মধ্যেই আরেকটি সাব-সাহারান আফ্রিকা তৈরি হয়েছে। ভারতের গ্রামীণ মানুষের শতকরা ৫০ ভাগ বা ৩৫ কোটিরও বেশি মানুষ সাব-সাহরান আফ্রিকার গড় পরিমাণের চাইতে কম খাদ্যশক্তি গ্রহণ করেন।’’[১৭] দারিদ্র্য নিয়ে তথ্য উপাত্তের এই ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি বাংলাদেশের জন্যও সত্য। উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশে

খাদ্যের দামবৃদ্ধির পেছনে ভারতের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে চাল রপ্তানি বন্ধ করা অন্যতম কারণ ছিলো।[১৮]

বাংলাদেশের মতো ভারতেও চোরাই অর্থনীতির আকার গত '৯০ দশকে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সম্প্রসারিত হয়েছে। বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে '৯০ দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এই অর্থনীতির আকার পাওয়া গেছে মোট জিডিপির শতকরা ৪০ ভাগ।[১৯] ১৯৮১ সালে এই হার ছিল শতকরা ২০ ভাগ। চোরাই অর্থনীতি, যা 'কালো' অর্থনীতি নামে পরিচিত। এই সম্প্রসারণ ঘটেছে অর্থনীতির বিকাশ ধারার মধ্যেই। এর প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতি ও বিনিয়োগ চরিত্রে পড়েছে অধিকতর হারে। বাংলাদেশের মতো ভারতেও এই চোরাই অর্থনীতির সুবিধাভোগী শতকরা ৩ ভাগ মানুষ কিন্তু এর জন্য দুর্ভোগের শিকার বাকি সকলে, ভবিষ্যতের প্রজন্ম সহ।

এশিয়ার মধ্যে সব চাইতে বেশি সংখ্যক বিলিয়নেয়ার আছে ভারতে। আগে এই স্থান ছিল জাপানের। দারিদ্র্য আর ঐশ্বর্য-র এরকম সহাবস্থান পৃথিবীর আর কোথাও এই মাত্রায় পাওয়া যাবে না। শিল্পভিত্তিক নির্মাণের ব্যাপারে না হলেও ঐশ্বর্য গঠনে বাংলাদেশের ধনিকগোষ্ঠীর আগ্রহ একইরকম।

ভারত যুক্তরাষ্ট্র সামরিক সম্পর্ক

ভারতে নতুনভাবে বিন্যস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত খাত, বেসরকারি খাত, যৌথ বিনিয়োগ, একক বিদেশি বিনিয়োগ সবগুলো মিলিয়ে ভারতে দেশি বৃহৎ পুঁজি, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত পুঁজি ও বহুজাতিক পুঁজির যে মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে তার সংবর্ধন, পুঞ্জীভবন এবং সম্প্রসারণের অনেক বেশি চাপ। চারপাশের দুর্বল দেশগুলো অতএব তার সুবিধাজনক ক্ষেত্র। এর সাথে খুব সঙ্গতিপূর্ণভাবেই ভারতের সামরিক চিন্তা পুনর্বিন্যস্ত হচ্ছে, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবল অংশীদার।

পুঁজিমুখি অর্থনৈতিক সংস্কারের পাশাপাশি সামরিক ক্ষেত্রে মার্কিন-ভারত সম্পর্ক নতুন মোড় নেয় '৯০ দশক থেকে। তবে এর আগে থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে এই অঞ্চলের নেতা হিসাবে গণ্য করতো। দক্ষিণ এশিয়া তো বটেই, এশিয়ার আরও বিস্তৃত অঞ্চলের জন্য বিশ্বপুঁজির কেন্দ্র এখন ভারত, একই সাথে মার্কিন নিরাপত্তা কৌশলের আঞ্চলিক কেন্দ্রও এখন ভারত। আফগানিস্তান ও পাকিস্তান বহু আগে থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতের মুঠোতে। ১৯৯৮ সালে ভারত ও পাকিস্তান দুদেশই পারমাণবিক বিস্ফোরণ পরিচালনা করে। এর কিছুদিনের মধ্যেই, ১৯৯৫ সালের বোঝাপড়ার সূত্র ধরে ২০০৫ সালের ২৮ জুন ভারত ও মার্কিন দুদেশের মধ্যে 'নিউ ফ্রেমওয়ার্ক ফর দ্য ইউএস-ইন্ডিয়া ডিফেন্স রিলেশনস' নামে নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী ২০১৫ পর্যন্ত দুইদেশ সামরিক ক্ষেত্রে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অন্যদিকে ২০০১ সালে আফগানিস্তানে হামলা চালানোর ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে পুরোমাত্রায় ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর বিনিময়ে পাকিস্তানের উপর থেকে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। আর ভারতের সঙ্গে চলে অধিকতর সামরিক নৈকট্য স্থাপনের কথাবার্তা এবং 'যৌথ স্বার্থে' নানা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য তৎপরতা। এসবেরই ফল ২০০৫ সালের চুক্তি। এই চুক্তির মধ্যে প্রকাশ্যেই যেসব বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে তার মধ্যে আছে:

- সামরিক ক্ষেত্রে পরস্পর অব্যাহত যোগাযোগ ও উন্নয়ন
- গোয়েন্দা তথ্য আদানপ্রদান বৃদ্ধি
- সমরাস্ত্র বাণিজ্য সম্প্রসারণ
- প্রযুক্তি স্থানান্তর, সহযোগিতা, যৌথ উৎপাদন, গবেষণা ও উন্নয়ন
- মিসাইল প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সম্প্রসারণ
- সামরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ
- নিরাপত্তা এবং সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় যৌথ তৎপরতা ও সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি
- যৌথ ও সমন্বিত মহড়া
- বহুজাতিক কর্মসূচিতে সহযোগিতা বৃদ্ধি [২০]

২০০৫ সালের ১৮ জুলাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর যুক্তরাষ্ট্রে সফরকালে বুশ-মনমোহন যুক্ত বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র-ভারত যৌথ সামরিক অবস্থান পরিষ্কার হয়। তারপর সর্বশেষ ২০০৬ সালের ১-২ মার্চ ভারতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের সফরের মধ্যে দিয়ে তা পাকাপোক্ত হয়। ভারতের বিশ্বশক্তি হিসেবে দাঁড়ানোর আকাঙ্ক্ষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়মিতভাবে সমর্থন দিতে থাকে, এশিয়ায় ন্যাটো গঠনের বিষয়ও আলোচনায় আসে। বিশ্বব্যাংক আইএমএফ সহ উদার অর্থনীতির দেশি বিদেশি পরামর্শকেরা বাজেট ব্যয় সংকোচনের জন্য বিরাষ্ট্রীয়করণ, শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে ব্যয়, কৃষিতে ভর্তুকি ইত্যাদি নিয়ে বরাবর আপত্তি করলেও সামরিক খাতে ব্যয় নিয়ে কখনো প্রশ্ন তোলে না।

১৯৯৮-৯৯ সালে ভারতের ঘোষিত সামরিক বাজেট ছিলো ৪৯ হাজার কোটি টাকা (রূপী), ২০০৫-৬ সাল নাগাদ তার প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে হয় ৯৭ কোটী টাকা। ২০১৩-১৪ সালের বাজেটে এটি আবারো দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পায়, এই বছরে দেখানো হয় ২ লক্ষ ৩ হাজার ৬৭২ কোটি টাকা।[২১] *সিপরি*-র সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, "২০০৪ সালে ২০০৪-০৮ এবং ২০০৯-১৩ সময়কালে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র আমদানি বৃদ্ধির হার শতকরা ১১১ ভাগ। এর ফলে আন্তর্জাতিক অস্ত্র আমদানিতে ভারতের অংশ শতকরা ৭ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১৪ ভাগে পৌঁছেছে। একই সময়ে পাকিস্তানের অস্ত্র আমদানি বেড়েছে শতকরা ১১৯ ভাগ।"[২২]

কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের স্থায়ী যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব

দুদেশেরই শাসকদের প্রথম থেকেই বাড়তি সুবিধা দিয়েছে। দেশে টেকসই দারিদ্র্য রেখে সামরিকীকরণ বিস্তারে এটি বরাবরই যুৎসই অজুহাত হিসেবে কাজ করেছে। ভারত সমরাস্ত্র আমদানিতে শীর্ষস্থানে পৌঁছেছে। অন্যদিকে পাকিস্তান পুরো দেশকে সামরিক কর্তাদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে।[২৩] সামরিক শাসন পরবর্তী নির্বাচিত সরকারে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয়নি। অন্যদিকে সামরিক শাসন না থাকলেও বাংলাদেশের একই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কয়েকদশক আগেই আর্নেস্ট ম্যান্ডেল বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থাকে 'স্থায়ী সমরাস্ত্র অর্থনীতি' (permanent arms economy) বলে সনাক্ত করেছেন।[২৪] এখন তা পরিমাণগত দিক থেকে আরও বিস্তৃত। ঋণক্লিষ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দারিদ্র্যক্লিষ্ট দক্ষিণ এশিয়ার সামরিকীকরণের স্থায়ী ও ক্রমবর্ধমান চাপ এরই দুই প্রান্তের কিন্তু জৈবিকভাবে সম্পর্কিত চিত্র উপস্থিত করে।

দক্ষিণ এশীয় বাণিজ্য চিত্র

দক্ষিণ এশিয়ার সবগুলো দেশই গত কয়েক দশকে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে অনেক বেশি যুক্ত হয়েছে, বিশ্ব বাণিজ্যে অংশগ্রহণ বেড়েছে বহুগুণ। তবে সেই তুলনায় এই অঞ্চলের দেশগুলোর নিজেদের মধ্যেকার অর্থনৈতিক যোগাযোগ অন্যান্য যে কোন অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম, রাজনৈতিক সম্পর্ক জটিল ও সংঘাতময়। নির্দিষ্টভাবে ১৯৯০-এর সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য অবশ্যই বেড়েছে কিন্তু বিশ্ববাণিজ্যের বৃদ্ধি ঘটেছে তুলনায় অনেক বেশি।

বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও আংকটাডের বাণিজ্য তথ্য থেকে দেখা যায়, বিশ্ববাণিজ্যের তুলনায় দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের বাণিজ্য শতকরা ১০ ভাগ, ভারতের শতকরা ২ ভাগ, আফগানিস্তানের শতকরা ৭ ভাগ, নেপালের শতকরা ৫৫ ভাগ, পাকিস্তানের শতকরা ৫ ভাগ, শ্রীলংকার শতকরা ১৮ ভাগ সংঘটিত হয়। সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার মোট বাণিজ্যের মধ্যে শতকরা ৪ ভাগ মাত্র এই অঞ্চলের মধ্যে। আংকটাডের হিসাব অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ায় বিদেশি বিনিয়োগের শতকরা ৯০ ভাগ ভারতে আসে। দক্ষিণ এশিয়া থেকে বাইরে যে বিনিয়োগ যায় তার পরিমাণ ১৪.৯ বিলিয়ন ডলার, এর মধ্যে ভারতের অংশ ১৪.৮ বিলিয়ন ডলার।[২৫]

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যসূত্র ভিত্তি করে করা বিশ্লেষণ অনুযায়ী ভারতের সাথে পাকিস্তানের বাণিজ্যে হ্রাসগতি দেখা গেলেও গত কয় বছরে শ্রীলংকা ও বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের সাথে পাকিস্তানের বাণিজ্য ছিলো যথাক্রমে ১৫ মিলিয়ন ও ৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১১ সালে তা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৭ মিলিয়ন ও ১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।[২৬]

দক্ষিণ এশিয়ার পারস্পরিক সহযোগিতা, মুক্ত বাজার, মুক্ত বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়গুলো সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা, ব্যবসায়িক গ্রুপ প্রভৃতির সভা সম্মেলনে প্রায়ই শোনা যায়।[২৭] তবে এসব আলোচনা গবেষণা ও বিশ্লেষণে যেহেতু কেন্দ্রীয় বিবেচনা থাকে কর্পোরেট স্বার্থ ও বাণিজ্যিক মুনাফা, সেহেতু জনস্বার্থ কেন্দ্রে রেখে আঞ্চলিক উন্নয়ন, সংহতি, পারস্পরিক সহযোগিতার কোন পথনির্দেশনা সেখান থেকে পাওয়া যায় না। উপরন্তু, ভারতের একাধিপত্যের জন্য একদিকে যেমন একটি বৃহৎ অর্থনীতিতে অন্য দেশগুলোর প্রবেশাধিকার নানাভাবে বাধাগ্রস্ত, অন্যদিকে অঞ্চলে উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে বহুপাক্ষিক সংলাপ ও পরিকল্পনার সুযোগ এখনও অনেক সীমিত। বস্তুত কতিপয় গোষ্ঠীর বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং বৃহৎ রাষ্ট্রের অনমনীয়তা থেকে মুক্ত হলে প্রাপ্ত সম্পদ ও জনশক্তি দিয়ে সমগ্র অঞ্চল মানুষকে অনেক সমৃদ্ধ জীবন নিশ্চত করতে সক্ষম।

বাংলাদেশ থেকে ভারতের মানুষকে বলার কথা

বাংলাদেশের এখন এরকম ধারণা বেশ জোরদার যে, ভারত সরকার বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির ওপর তার প্রভাব ও আধিপত্য বৃদ্ধি করতে সর্বতোভাবে সক্রিয়। এই অবস্থা নিশ্চিত করতে তারা বর্তমান সরকারকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে সকল সমর্থন প্রদান করেছে। সেকারণে সরকার একতরফা নির্বাচন করতে সক্ষম হয়েছে। 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার' কথা বলে, এবং জামায়াত সম্পর্কে সমাজের যুক্তিযুক্ত ভীতি কাজে লাগিয়ে সরকার বস্তুত 'উন্নয়নের' পুরনো পথেই হাঁটছে। দুর্নীতি, দখল, লুণ্ঠন এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন চুক্তির ক্ষেত্রে বিএনপি-জামায়াত সরকারের সাথে এই সরকারের কোন তফাৎ নেই।

বলা হয়, ভারত বাংলাদেশের গণতন্ত্র রক্ষা ও এইদেশের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বজায় রাখতে সহযোগিতা করবে। কিন্তু এই প্রশ্নটি তো খুবই যুক্তিসঙ্গত যে, যেদেশে সরকার সেইদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিককে সাম্প্রদায়িক, জাতিগত, শ্রেণীগতসহ সবরকম নিপীড়ন ও বৈষম্যের মধ্যে আটকে রাখে তারা আরেক দেশে শান্তি, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কী সহযোগিতা করতে পারে? তাছাড়া সাংবিধানিকভাবে ভারত ধর্মনিরপেক্ষ হলেও এই রাষ্ট্রকে কোনভাবেই অসাম্প্রদায়িক বলা যায় না। সমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী ভাবধারার ওপর ভর করেই বিকশিত হয়েছে বিজেপি ও উগ্র ধর্মান্ধ হিংস্র বর্ণবাদী গোষ্ঠী। বাংলাদেশ ও ভারতে, দুই ধর্মের আবরণে হলেও, একটি আরেকটির অনিবার্য মিত্র কিংবা পুষ্টিদাতা। ভারতের নৃশংস সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সমার্থক নাম নরেন্দ্র মোদী, এখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবার পথে। এদের প্রবল সমর্থক ভারতের বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। মার্কিন ইউরোপীয় বহুজাতিক

কোম্পানীগুলো মোদীর পক্ষেই অবস্থান নিয়েছে। ভারতের এই পরিস্থিতি বাংলাদেশেও ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের জন্য উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করছে। গত একবছরে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনাবলী বিজেপি-কে অনেক রাজনৈতিক সুবিধা দিয়েছে। শোষণ বৈষম্য ও নিপীড়ন ভরা এই ভারতের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ তাহলে কোন্ বাংলাদেশ তৈরি করবে?

বাংলাদেশের সবচাইতে বড় শিল্প গার্মেন্টিস খাতে এখন ভারতের প্রভাব বাড়ছে, চার শতাধিক বায়িং হাউজ ভারতেরই। শিক্ষা, চিকিৎসা, মিডিয়া, বিনোদন জগতেও তাদের প্রভাব অনেক, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার নানা আয়োজন চলছে। ভূমি ও বসতি বাণিজ্যেও অনেক প্রস্তাব আছে। বিদ্যুৎ খাতে নিয়ন্ত্রণ আনার নানা প্রকল্প কাজ করছে। সুন্দরবন বিপন্ন কিংবা ধ্বংস করে রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজ করছে ভারতেই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান *এনটিপিসি*। সুন্দরবন ভারতেও বিস্তৃত। বাংলাদেশের সুন্দরবন যদি ক্ষতবিক্ষত হয়, ভারতেও সুন্দরবন অক্ষত থাকবে না।

বাংলাদেশে ভারত সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যেসব বিষয়ে যুক্তিযুক্ত ক্ষোভ আছে সেগুলো ভারতের মানুষের কাছে কখনোই পরিষ্কার করা হয়না। আমরা ভারত সম্পর্কে যতোটা জানি সেই তুলনায় আপনারা বাংলাদেশ সম্পর্কে জানেন অনেক কম। আমরা আপনাদের বই পাই, আপনাদের প্রায় সবগুলো টিভি চ্যানেল আমরা দেখি। আপনারা আমাদের টিভি দেখতে পারেন না, বইপত্রও আসে খুব কম। আপনাদের মিডিয়ার বাংলাদেশ সম্পর্কে সেসব খবরই গুরুত্ব পায় যাতে মনে বাংলাদেশ 'মৌলবাদ জঙ্গি' অধ্যুষিত দেশ। কিন্তু এর বিরুদ্ধে লড়াই ও চিন্তার খবর কমই আসে, কম আসে ভারত সম্পর্কে বিস্তৃত ক্ষোভের কারণ। যতটুকু আসে তাতে এই ক্ষোভকে চিত্রিত করা হয় 'মৌলবাদী' অপপ্রচার হিসেবে।

ভারতের দিক থেকে ট্রানজিটের অর্থনৈতিক যুক্তি নিশ্চয়ই খুবই শক্তিশালী।[২৮] কিন্তু এর ফলাফল বাংলাদেশে কী হবে সেদিকটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, ভারতে অন্য দেশের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করে গোপনীয়তা ও বৈরিতার মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন যে কোনোভাবেই টেকসই হবে না তা বলাই বাহুল্য। আপনারা অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' বইটার কথা জানতে পারেন, এটি নিয়ে ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রের কথা নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু এই খবর জানেন না যে, ভারতের ভারী যন্ত্রপাতি নেবার জন্য সেই নদী আড়াআড়িভাবে ভরাট করা হয়েছিল। ভারতের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পার হয়ে ভারতেরই আরেক অঞ্চলে নেবার জন্য এরকমই নানা ব্যবস্থা করা হচ্ছে, জনগণকে না জানিয়ে। এর জন্য বাংলাদেশের কী লাভ কী ক্ষতি এগুলো সম্পর্কে সরকার জনগণকে পরিষ্কারভাবে কিছু জানায়নি। ভারতের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে বাংলাদেশে অবকাঠামো প্রস্তুত করছে। অথচ বাংলাদেশের তিনদিকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে ভারত, সন্ত্রাসীদের ঠেকানোর নামে। তিনদিকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরাও হয়ে থাকবে একদেশ, অন্যদেশের রাষ্ট্র সীমান্ত হত্যা চালাতে থাকবে, কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে বাক্সবন্দী করে বন্ধুত্ব করবার কথা বলবে। কীভাবে তা বিশ্বাসযোগ্য হবে? প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে ইসরাইল এরকম বেড়া দিয়েছে। ভারত বাংলাদেশের সাথে কি সেরকম সম্পর্ক তৈরি করতে চায়? ভারতের মানুষ কি তা অনুমোদন করেন?

আপনারা সীমান্ত হত্যার খবর খুব কম জানেন। আপনারা জানেন না যে, ফরাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশের ক্ষতি কতদূর বিস্তৃত হয়েছে। ফরাক্কার কারণে গঙ্গা-পদ্মা বিপর্যয়ের পর তিস্তার ধু ধু চর ভারতের নানা পরিকল্পনার ফল। এরপর আবার টিপাইমুখ বাঁধ দেবার চেষ্টা করলে মানুষ কেন ক্ষুব্ধ হবে না? বাংলাদেশ ও ভারতের অভিন্ন ৫৪টি নদী নিয়ে কোন চুক্তি হয়নি, তিস্তা নদী নিয়ে বিরোধ ঝুলে আছে। আপনারা জানেন না যে, ভারতের বিনিয়োগ বাংলাদেশে অগ্রাধিকার পেলেও ভারতে বাংলাদেশের বিনিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা মাত্র বছরখানেক আগে শিথিল করা হয়েছে, কিন্তু এখনও নানা বাধাবিপত্তি বজায় আছে। ভারত থেকে বাংলাদেশে আইনি পথে যেসব পণ্য আসে তার থেকে বেশি আসে বেআইনিভাবে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে ভারতে আইনিভাবে পণ্য নিতে গেলেও শত অশুল্ক বাধা। এতসব বৈষম্য, অসম্মান ও আধিপত্যের ঘটনা থাকলে আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষ মাত্রই তার প্রতিকার চাইবে। এই ক্ষোভকে ভারতবিরোধী বিদ্বেষ বা মৌলবাদীদের তৎপরতা হিসেবে চিত্রিত করা মানে মূল ইস্যুকে আড়াল করা। তাতে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের রাস্তাই প্রশস্ত হবে।

গত ৩১ মার্চ রংপুর থেকে তিস্তা নদী অভিমুখে লংমার্চ হয়েছে। ৮ এপ্রিল ঢাকা থেকে তিস্তা অভিমুখে লংমার্চ হতে যাচ্ছে। তিস্তার মরণদশা দেখে ভারতের ভূমিকায় মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। শুধু তিস্তা নয়, আগে পরের আরও অনেক ঘটনা এই ক্ষোভের বিস্তার ঘটাচ্ছে। গত ১ এপ্রিল ফেসবুকে এক তরুণের ভাষ্য এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে, "ভারত উজানে স্থায়ীভাবে গঙ্গা নদীতে ফরাক্কা বাঁধ, তিস্তায় গজলডোবা বাঁধ, মনু নদীতে নলকাথা বাঁধ, যশোরে কোদলা নদীর উপর বাঁধ, খোয়াই নদীর উপর চাকমা ঘাট বাঁধ, বাংলাবন্ধে মহানন্দা নদীর উপর বাঁধ, গোমতি নদীর উপর মহারানি বাঁধ এবং মুহুরি নদীর উপর কলসী বাঁধ নির্মাণ করে শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশকে পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করছে বছরের পর বছর। এছাড়াও আরও কমপক্ষে ১৫টি সীমান্ত নদীর উপর অস্থায়ী ভিত্তিতে কাঁচা বাঁধ নির্মাণ করে। বর্ষায় এসব অস্থায়ী বাঁধ

কেটে দেয়া হয়। ভারতের এরকম পানি আগ্রাসী নীতির কবলে পড়ে শুষ্ক মৌসুমে দেশের নদনদীগুলো পানিশূন্য হয়ে পড়ে। আর বর্ষায় বাংলাদেশকে ভাসানো হয় পানি দিয়ে। এছাড়াও সীমান্তে নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে ভারত পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করে বাংলাদেশ অংশে ব্যাপক ভাঙনের সৃষ্টি করছে। ভারতের এমন নীতির কবলে পড়ে প্রতি বছর বাংলাদেশের শত শত কোটি টাকার সম্পদ নদী গর্ভে চলে যাচ্ছে।''

শক্তিশালী দেশ নিজ দেশের জনগণকে যেমন অজ্ঞ, তথ্য গোপন বা বিকৃত করে বিভ্রান্তির মধ্যে আটকে রাখতে চেষ্টা করে, তেমনি চেষ্টা করে সীমান্তের বাইরের জনগণের সাথে দেশের মানুষের যোগাযোগ সুযোগ যতটা সম্ভব কম রাখতে। যদি ভারতের জনগণ বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্যবাদী অন্যায় তৎপরতার বিরুদ্ধে সরব হন, তাহলে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে এই বিষয়টি পরিষ্কার হবে যে, ভারতের জনগণ তাদের সরকার বা প্রভাবশালী গোষ্ঠীর অন্যায় কাজের শরিক নন। রামপালে যখন ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান উচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করতে শুধু বাংলাদেশের নয়, মানবসমাজের একটি স্থায়ী ক্ষতি করতে উদ্যত তখন যদি ভারতের সজাগ মানুষেরা নীরব থাকেন তাহলে পরিস্থিতির মধ্যে কোন পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে না। ভারতের মানুষ যদি রামপাল প্রকল্প, সীমান্ত হত্যা, ট্রানজিট নিয়ে গোপন চুক্তি, টিপাইমুখ বাঁধ, তিস্তা সহ যথাযথভাবে নদী চুক্তি নিয়ে টালবাহানা, অসম বাণিজ্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন তাহলে বাংলাদেশের মানুষ তার বন্ধু ভারতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারবে।

জনগণের সংহতি কোথায়?

এভাবেই গড়ে উঠতে পারে সংহতি। রাষ্ট্র ও জনগণ সমার্থক নয়। অখণ্ড কোন দেশ নেই, একক সত্তা বলে কোন কিছু নেই। জাতীয়তাবাদী কিংবা ধর্মান্ধ আওয়াজ তুলে রাষ্ট্র নিজের পেছনে মানুষকে জমায়েত করতে চায়, সংঘাত আর বৈরিতার দেয়াল তুলতে চায় জনগণের মধ্যে। কিন্তু সবদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থ অভিন্ন। তাদের সকলেরই নদী রক্ষা করা দরকার, ভূমি বসত জীবিকা রক্ষা করা দরকার। কোম্পানি, সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য এবং সাময়িকীকরণ থেকে মুক্ত হওয়া দরকার।

সবদেশেই কর্পোরেট জগতের একটি অভিন্ন প্রচার আছে। যারা মানুষের জীবনজীবিকার পক্ষে দাঁড়ায়, যারা ভুল প্রতিশ্রুতিতে নির্মিত বাঁধের জন্য উচ্ছেদ হওয়া কোটি কোটি মানুষের লড়াই-এ শামিল, যারা নির্বিচার রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড, লক্ষ কোটি মানুষ উচ্ছেদ করে 'কর্পোরেট হাব' বানানোর বিরোধী, যারা জনগণের শিক্ষা ও চিকিৎসার অধিকার নিয়ে সোচ্চার তাদেরকেই, বাংলাদেশের মতোই ভারতেও 'উন্নয়ন বিরোধী' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

তবে ভারতের সাথে অন্য দেশগুলোর তফাৎ আছে। ভারতের রঙীন চলচ্চিত্র, আইপিএল, টিভি বাক্সে ঐশ্বর্য আর বিজ্ঞাপনের সুখ সেদেশের জনগণকে যেমন নেশাগ্রস্ত রাখে, তা সম্প্রসারিত হয় অন্যদেশেও। ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলোর জনসংযোগ মাধ্যম হিসেবে তাদের মিডিয়ার অবিরাম সত্যগোপন সত্যবিকৃতি মিথ্যাচার, খলনায়ককে নায়ক হিসেবে উপস্থাপনের আয়োজনের টার্গেট এখন ভারতের জনগণের সাথে সাথে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যদেশের জনগণও। উন্নয়ন দর্শনে রাষ্ট্রগুলোর সংহতি আছে, সেখানে কাঁটাতার নেই। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দেশ ভারতের সাথে অন্যদেশের জনগণের যোগাযোগ খুবই কম— মাঝখানে দৃশ্যমান অদৃশ্য অনেকরকম কাঁটাতার। সরকার মিডিয়া এই দূরত্ব টিকিয়ে রাখতে, আরও বাড়াতে, সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে নিয়োজিত।

জল জমি জঙ্গলের মতো মাটির উপর আর নীচের সাধারণ সম্পত্তি দখল আর তার উপর মুনাফার কারখানা বসানোর বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদে প্রতিরোধে তৈরি হচ্ছে রক্তের কাহিনী। ফুলবাড়ীতে হয়েছে, হয়েছে কলিঙ্গনগর আর নন্দীগ্রামে। প্রচলিত নয়া উদারতাবাদী উন্নয়ন দর্শন যে বামপন্থীদেরও গ্রাস করেছে তার দৃষ্টান্ত দেখা যাচ্ছে সবখানেই। অনেকক্ষেত্রেই পুনর্বিন্যস্ত হচ্ছে মানুষ, লড়াই, সংগঠন। সারা ভারত জুড়ে এখন একদিকে দেশি বিদেশি ব্যবসায়ী সংস্থার জমি জল জঙ্গল দখল, উচ্ছেদ বা বিষাক্ত করে মুনাফা বানানোর নানা প্রকল্প, অন্যদিকে তার প্রতিক্রিয়াতেই মানুষের প্রতিরোধের নতুন নতুন রূপ। বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশেও দৃশ্যপট কমবেশি একই।

সবদেশে আমরা যারা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলেও অভিন্ন স্বপ্ন নিয়ে লড়াই করি তারা মানুষের জীবনকে কেন্দ্রে রেখে উন্নয়ন বিচার করি, আর তাই প্রকৃতি পানি মাটি রক্ষাও আমাদের কর্তব্য জ্ঞান করি। আমাদের কাছে শিক্ষা চিকিৎসা অধিকার, ব্যবসায়ীর পণ্য নয়। আমরা নদী, পানি, বন ও খনিজ সম্পদকে আমাদের সবার সম্পত্তি মনে করি; এগুলো কোনোভাবে মুনাফাখোরদের হাতে যেতে দিতে চাই না। আমাদের কাছে মানুষের মর্যাদা সবার ওপরে, লিঙ্গ বা ধর্ম বা বর্ণ বা ভাষা বা জাতি নয়। আমরা মনে করি, এই বিশ্বে মানুষের জন্য সম্পদের কোন অভাব নেই, কিন্তু লুটেরা দস্যুদের জন্য সেই সম্পদ মানুষের হাতছাড়া অথবা বিপর্যস্ত। তাদের দখল লোভের জন্যই যুদ্ধ সংঘাত নিপীড়ন আর এই রাষ্ট্রব্যবস্থা। এর বিরুদ্ধে মানুষের দক্ষিণ এশিয়ার কণ্ঠ অভিন্ন, জীবন ও মরণ অভিন্ন লড়াই-এ নিয়োজিত। এটা শ্রেণী সংগ্রাম, এটা জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, এটা অমানুষের বিরুদ্ধে মানুষের মুক্তির অবিরাম লড়াই।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্ব এক জায়গায়

থেমে নেই। ফুকুয়ামার কথামতো 'ইতিহাসের সমাপ্তি' হয়নি, উদার গণতন্ত্র বিশ্বজনীন হয়নি, বরং বিশ্বব্যাপী আরও পশ্চাৎপদ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছে।[২৯] সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, চীনের রূপান্তরের পর, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিপ্লবী চিন্তার কাঠামো এখন আর কার্যকর নয়। বিশ্বে মুক্ত সমাজ মুক্ত মানুষের চিন্তা ও লড়াই নতুন পর্বে প্রবেশ করেছে। তত্ত্ব ও সংগঠন নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সৃজনশীলতা তাগিদ তৈরি হয়েছে।[৩০]

আশার কথা এই যে, মানুষ নির্দিষ্ট মডেলের পতনে থেমে নেই। সব দেশেই জনগণের বিভিন্ন মাত্রার লড়াই আছে জল জমি জঙ্গলের ওপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, লড়াই আছে কর্পোরেট আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে, লড়াই আছে শ্রেণী, জাতি, ধর্মীয়, লিঙ্গীয় নিপীড়ন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে, লড়াই আছে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিরুদ্ধে। ভারত রাষ্ট্রের আধিপত্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও লড়াই আছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সকল দেশেই। এসব লড়াই-এর মধ্যে যে ঐক্যসূত্র আছে তা থেকেই আমরা একটি মুক্ত দক্ষিণ এশিয়ার স্বপ্ন দেখতে পারি, যেখানে কর্পোরেট স্বার্থ নয়, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের নতুন চেহারা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। গণতন্ত্র, সাম্য ও মর্যাদা নিয়ে নতুন ইতিহাস পর্বে প্রবেশ করবে মানুষ। কিন্তু এর জন্য জনগণের লড়াই ও মুক্ত চিন্তার যে সংহতি দাঁড় করানো দরকার সেখানে বড় ঘাটতি আছে। আমাদের চিন্তা ও সক্রিয়তা এই ঘাটতি দূর করায় নিয়োজিত করা দরকার।

আমাদের নিজেদের মধ্যে তাই যোগাযোগ বাড়ানো দরকার, কথা বলা দরকার। সংহতি দৃঢ় করার জন্য বিতর্ক করা দরকার। নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে আমরা এই বার্তা জোরদার করতে পারি। প্রাথমিকভাবে কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা জোর দিতে পারি:

প্রথমত, মুক্ত বিশ্বের রূপকল্পের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে মুক্ত দক্ষিণ এশিয়ার রূপকল্প দাঁড় করানো এবং তা মানুষের চিন্তার মধ্যে আনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া।

দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ এশিয়ার সকল সম্পদ, বিশেষত খনিজ সম্পদ ও পানি সম্পদ যাতে সকল মানুষের কাজে সর্বোত্তম ব্যবহার করা সম্ভব হয় সেজন্য আঞ্চলিকভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন বা নকশা তৈরির কাজ। এটা হবে বিশ্বব্যাংক ইউএসএইড ও দেশি-বিদেশি ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর মুনাফামুখী উন্নয়ন কৌশলের পাল্টা নকশা।

তৃতীয়ত, নদী ও পানি প্রবাহ নিয়ে, সকলের অধিকারে স্বীকৃতি দিয়ে সমন্বিত চিন্তা ও পরিকল্পনা মূর্ত করা।

চতুর্থত, সাম্প্রদায়িকতা মৌলবাদ, শ্রেণী লিঙ্গ জাতি বর্ণগত নিপীড়ন ও বৈষম্য বিরোধী আমাদের চিন্তা ও লড়াইকে পরস্পরের কাছে পরিষ্কার রাখা, সমন্বয় করা।

টীকা

১। এর একটি দৃষ্টান্ত, ১৯৭১ সাল থেকে ২০০৭ পর্যন্ত বাংলাদেশ নিয়ে লেখাগুলোর সংকলন গ্রন্থ, *বাংলাদেশ প্রসঙ্গে*, সম্পাদনা দীপংকর চক্রবর্তী, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

২। বিস্তারিত দেখুন, Alkire, S Roche, J M Santos, ME and Seth, S (2011), http://ophi.qeh.ox.ac.uk, Multidimensional Poverty Index : 2011 Data, Oxford Poverty and Human Development Initiative, November. Available at www.ophi.org.uk/policy/miltidimensional-poverty-index/

৩। ৭০ দশকে এই তিন দেশের অভিন্ন গতিপ্রকৃতি নিয়ে বিশ্লেষণের জন্য দেখুন : Jalal A (1997). Ayesha Jalal, *Democracy and Authoritarianism in South Asia*, Cambridge University Press

৪। বৈশ্বিক আগ্রাসন প্রকল্পের শিকার আফগানিস্থানের বিভিন্ন পর্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখতেপারেন, আনু মুহাম্মদ, *বিশ্বায়নের বৈপরীত্য*, ২য় সংস্করণ, ঢাকা, ২০১০

৫। কীভাবে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে কাজ করছে সে সম্পর্কে একটি গবেষণার জন্য দেখুন: Shapan Adnan (2013) : 'Land Grab and Primitive Accumulation in deltaic', 'Bangladesh : interactions between neoliberal globalisation, state interventions, power relations and peasant resistance', *The Journal of Peasant Studies*, 40:1, 87-128

৬। ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়ার উদ্ভব ও ধরণ নিয়ে এই গ্রন্থটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ Suniti Kumar Ghosh (1985) : *The Indian Big Bourgeoisie*, Subarnarekha, Calcutta, এই গ্রন্থ নিয়ে পার্থ চ্যাটার্জির পর্যালোচনাও বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে, যেটি পরে নিম্নোক্ত গ্রন্থে সংকলিত হয়: Partha Chatterjee (1997), *A Possible India*, OUP, New Delhi

৭। Arundhati Roy (2012), 'Capitalism A Ghost Story', *Outlook*, 26 March

৮। ভারতের প্রবাসী আয় ও এর উৎসসমূহ নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দেখুন : (http://www.silieonindia.com/news/business/15-Nations-Sending-Highest-Remittances-to-India-nid-147515-cid-3.html)

৯। GOB (2013), *Govermnment of Bangladesh, Ministry of Finance : Poverty Report*, June. বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ ও এনজিও মডেল নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন : Anu Muhammad (2009) : "Grameen and Microcredit : A Tale of Corporate Success", *Economic and Political Weekly*, August 29, Mumbai

১০। "the decade of the War on Terror and India's debut on tha world's stage as an economic and nuclear power. To some these years have brought undreamt of wealth and prosperity, to others such penury, such starvation, such despair as to render them barely human. To the Muslims of Gujarat they brought genocide. To the Muslims of India the spectre of Hindu fascism. To more than a hundred thousand farmers they brought suicide. To corporations, prospecting for profits, they brought unimaginable returns on investment. To the adivasis of Dantewada they brought enforced displacement and a brutal, goverment-sponsored civil war. To people in Kashmir, Manipur, Nagaland they brought continued military occupation elaborately dressed up as 'normality'." Arundhati Roy(2008), *The Shape of the Beast*, Penguin India.

১১। http://www.progressive.org/intv0401.html

১২।"How India lives", *Frontline*, February 5, 2014 based on the 69th round of the National Sample Survey Office (NSSO) in its nationwide survey on "Drinking water, sanitation, hygiene, and housing condition in India" conducted from July to December 2012, covering 4,475 villages and 3,522 urban blocks.

১৩। World Bank, 2010, *Food Price Increases in South Asia : National Responses and Regional Dimensions*, Washington DC.

১৪। FAO/WFP 2008, *Crop and Food Supply Assessment Mission to Bangladesh*, Special Report, Rome, quoted in Selim Raihan and Towfiqul Islam Khan (2013) : *Impact of Indian policies on Rice Price in Bangladesh*, CMI, CPD, Dhaka

১৫। Bayes, A and Hossain, M. 2008, *Marketing of Crops: Who Gains and Who losses from Rice Prices?* BRAC Seminar, 21 August, Dhaka.

১৬। Utsa Patnaik (2013); Poverty Trends in India 2004-05 to 2009-10 *Economic & Political Weekly,* October 5.

১৭। Utsa Patnaik (2005): "It is time for Kumbhakarna to wake up". *Hindu*

১৮। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Raihan and Khan (2013), পুর্বোক্ত

১৯। Kumar, Arun (1999) : *The Black Economy in India*, Penguin Books, New Delhi.

২০। বিস্তারিত আলোচনার জন্য The Research Unit for Polotical Economy (2005) : *Aspects of India's Econimy*, Mumbai, December.

২১। Aspect পুর্বোক্ত, এবং http://www.idsa.in/idsacomments/IndiasDefenceBudget2013-14_Ikbeheria _040313

২২। (http://www.sipri.org/media/pressreleases/2014/AT_march_2014)

২৩। Siddiqa, Ayesha (2007). *Military Inc. : Inside Pakistan's Military Economy*, Pluto Press.

২৪। Ernest Mandel (1976), *Late Capitalism*, London । এবিষয়ে আমার দুটো গ্রন্থে আরও বিস্তারিত পর্যালোচনা আছে: *পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ ও অনুন্নত বিশ্ব*, ২য় সংস্করণ, শ্রাবণ, ২০০৬, *বিশ্ব পুঁজিবাদ ও বাংলাদেশের অনুন্নয়ন*, ২য় সংস্করণ, সংহতি, ২০০৭।

২৫। UNCTAD, 2012, *World Investment Report 2012.*

২৬। Mahmood, Hamid 2012. "Accelerating Trade in South Asia: A Case Study of Pakistan" in Debapriya Bhattacharya and Mustafizur Rahman(ed.): *Global Recovery, New Risks and Sustainable Growth. Repositioning South Asia*, CPD, Dhaka, September.

২৭। সর্বশেষ একটি আঞ্চলিক সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ ও আলোচনার বিবরণীর জন্য দেখুন : Bhattacharya and Rahman (2012) Debapriya Bhattacharya and Mustafizur Rahman: *Global Recovery, New Risks and Sustainable Growth. Repositioning South Asia*, CPD, Dhaka, September.

২৮। একটি গবেষণা পত্রে দেখানো হয়েছে, (১) নয়াদিল্লী থেকে ঢাকায় ২০ ফুট একটি কনটেইনার সমুদ্রপথে নিয়ে যেতে (মুম্বাই, সিঙ্গাপুর অথবা কলম্বো হয়ে চট্টগ্রাম এবং পরে ট্রেনে ঢাকা) সময় লাগে ৩০ থেকে ৪০ দিন, এবং খরচ লাগে ২৫০০ মার্কিন ডলার। এটি যদি সরাসরি দিল্লী থেকে ট্রেনে পরিবহন করা হয় সময় লাগবে ৪-৫ দিন, খরচ হবে ৩ ভাগের এক ভাগ, ৮৫০ মার্কিন ডলার। (২) ভারতের পাঞ্জাব থেকে পাকিস্তানের পাঞ্জাবে পণ্য পরিবহনে ট্রেন সীমিত থাকায় তা করাচি হয়ে প্রায় ৩০০০ কিমি ঘুরে যায়। সড়কপথে গেলে দূরত্ব হবে ৩০০ কিমি। (৩) ভারতের অনুমতি না থাকায় ঢাকা থেকে লাহোরে পণ্য পরিবহণ স্থলপথে না করে করতে হয় মুম্বাই করাচি হয়ে সমুদ্রপথে, তাতে দূরত্ব ২৩০০ কিমি থেকে প্রায় ৩ গুণ বেড়ে হয় ৭১৬২ কিমি। (৪) বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পণ্য পরিবহন করলে আগরতলা থেকে কলকাতা বা আসাম থেকে কলকাতা দূরত্ব যথাক্রমে ৬ ভাগের ১ ভাগ ও ৪ ভাগের ১ ভাগ দাঁড়াবে।

Kharel, P. 2009, *Case for South Asian Transit Arrangement*, Briefing Paper No 11, Kathmandu:SAWTEE

২৯। ফুকুয়ামা নিজেও কয়েকবছরের মধ্যে নিজের ভুল স্বীকার করেছেন। দেখুন, Francis Fukuyama (2007) : *After the NeoCons*, Profile Books, London

৩০। এই পর্বে এককালে বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এখন সাংগঠনিক তৎপরতা থেকে বিচ্ছিন্ন, দর্শনচর্চায় খুবই প্রভাবশালী এরকম তিনজন ব্যক্তিত্বের সোভিয়েত পরবর্তী চিন্তার পরিচয় পর্যালোচনা করেছেন আইজাজ আহমেদ। তাঁরা মার্কসের কাছেই ফেরত আসছেন বারবার, যদিও সাংগঠনিক প্রক্রিয়া নিয়ে তাঁদের মধ্যে অনেক মতপার্থক্য আছে। দেখুন : Ahmad, Aijaz (2012), 'Three 'Returns to Marx : Derrida, Zizek, Badiou', *Social Scientist*, Vol, 40, No. 7/8 (July-August).

ভ্রম সংশোধন

● অনীক জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সংখ্যায় ৩০ পৃষ্ঠায় 'দেবযানী উপাখ্যান: ভারত-মার্কিন সংঘাত' প্রবন্ধে দেবযানী খোবরাগোড়ে-র স্বামীর নাম ভুলক্রমে ছাপা হয়েছে আকাশ সিং। এটি হবে আকাশ সিং রাঠোর। ২৯ পৃষ্ঠায় প্রবন্ধের প্রথম লাইনে পড়তে হবে দেবযানী খোবরাগোড়ে (রাঠোর)।

● মার্চ ২০১৪, ৩ পৃষ্ঠায় 'দ্বিতীয় ক্রিমিয়ার যুদ্ধ' রচনায় টলস্টয়ের উপন্যাসটির নাম হবে *সেবাস্তপোল* ।

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা।

পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন নম্বর ৯৮৩০৯২২১৮৪ বা ৯৩৩১০১২৫৩৭

ঘটনাপ্রবাহ

ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির পর এবার রাশিয়া

সোভিয়েতের পতনের পর সেদেশটি যখন ছোট ছোট দেশে বিভক্ত হয়ে পড়ল, তখন দেখা গেল নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন চুল্লির বেশির ভাগই মূল ইউরোপীয় রাশিয়ার ভাগ্যে পড়ে নি। অখণ্ড সোভিয়েত রাশিয়া নিরাপত্তার কারণে তার নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলি রাজধানী মস্কো থেকে দূরে তৎকালীন অন্য সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলিতে ছড়িয়ে দিয়েছিল। পতন পরবর্তী রাশিয়ার তাই নিউক্লিয়ার চুল্লি উৎপাদন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা দক্ষতায় শোচনীয় ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

এ সত্ত্বেও ভারত সরকার যাবতীয় জনমত উপেক্ষা করে এক অপ্রমাণিত, নড়বড়ে প্রযুক্তির নিউক্লিয়ার চুল্লি কেনা সাব্যস্ত করেছে রাশিয়ার নিজস্ব পিপিপি মডেলে চলা সংস্থা রোশ-এটম থেকে। তার দুটি চুল্লি ২২ বছর পর তামিলনাড়ুর কোদানকুলমে বসেছে। বারবার যান্ত্রিক গোলযোগ, প্রযুক্তিগত বাধা, অপ্রত্যাশিত নিম্নমানের দক্ষতা ইত্যাদি কারণে এই দুটি চুল্লি আজও জাতীয় শক্তিচক্রে এক কণাও বিদ্যুৎ যোগাতে সক্ষম হয়নি। বর্তমানে ভারত সরকারের ঘোষণা মতে প্রথম ইউনিটটি এ বছরের এপ্রিলের কোনও এক সময়ে এবং দ্বিতীয় ইউনিটটি অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে জাতীয় শক্তিচক্রে যুক্ত হতে পারে। ভারতীয় শক্তিচক্রে নিউক্লিয়ার বিদ্যুতের পরিমাণ এতই অকিঞ্চিৎকর যে ভারতের নিউক্লিয়ার সাম্রাজ্যের অধীশ্বররা নিউক্লিয়ার বিদ্যুতের শতকরা পরিমাণ জানান না, কী পরিমাণ উৎপাদন হলো সেটাই সগর্বে জানিয়ে থাকেন।

সম্প্রতি যে বিষয়টা আমাদের ভাবাচ্ছে তা হলো রাশিয়ার ভিভিইআর প্রজন্মের প্রযুক্তি সারা পৃথিবীতে প্রশ্নের মুখোমুখি। স্পেন বা অন্যান্য দেশ তো এই প্রযুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে রাশিয়ার চুল্লি ফিরিয়ে দিচ্ছে বলা যেতে পারে। দুর্ঘটনার বিষয়টি এখন আর সম্ভাবনার স্তরে নেই। তা প্রায় নিশ্চিত বলেই বিভিন্ন মহলের মত।

বস্তুত, চের্নোবিল দুর্ঘটনা ও হালের ফুকুসিমা দুর্ঘটনার পর বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে যেমন, তেমনি সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নিউক্লিয়ার প্রযুক্তির বিভিন্ন রকমফের, যা নিয়ে মার্কিন দেশ, ফ্রান্স, চীন, রাশিয়া ও ইংলন্ড বড়াই করে থাকে, এই দুর্ঘটনা প্রবণতা থেকে এইসব দেশেরও কোনও প্রযুক্তিই মুক্ত নয়।

এমতাবস্থায় দুর্ঘটনা-সংক্রান্ত বিষয়ে আগাম সতর্কতা প্রদানকারী ও নজরদারি স্বশাসিত সংস্থা আইএইএ-কে এড়িয়ে গিয়ে মার্কিন দেশ ভারতের সঙ্গে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করে। বহুপাক্ষিক সমঝোতার মাধ্যমে যে সুরক্ষা পাওয়া যেত, তাকে পাশ কাটিয়ে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করে। ২০০৬ সালে স্বাক্ষরিত সেই চুক্তিকে আমরা ১২৩-চুক্তি বলে জানি। সেই চুক্তির মূল কথা হলো নিউক্লিয়ার দুর্ঘটনা ঘটলে মার্কিন দেশ তার নিজের দেশে যে দায় স্বীকার করে, ভারতে সমতুল্য কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে মার্কিন দেশ তার দায় নেবে না, দায় নিতে হবে ভারত সরকারকে। অর্থাৎ, মুনাফার ভাগ পাবে মার্কিন দেশ, আর সেই মুনাফার দায় নেবে ভারত সরকার।

ভারত-মার্কিন এহেন দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে উৎসাহী হয়ে প্রথমে ফ্রান্স এবং পরে স্পেন ভারতের সঙ্গে একই রকম চুক্তিতে আগ্রহী হয়ে পড়ে। নানা কারণে সেই উদ্যোগ একটু স্তিমিত থাকলেও রাশিয়ার উদ্যোগ ফলপ্রসূ হলো।

এ বছর মার্চ মাসে এই চুক্তি করার জন্য রোশ-এটম-এর এক প্রতিনিধি কয়েক ঘন্টার জন্য ভারত সফরে এসে চুক্তি করে যান। এতে ভারত ও রোশ-এটম কোদানকুলমের তৃতীয় ও চতুর্থ ইউনিটের জন্য 'টেকনো-কমার্শিয়াল চুক্তি' সম্পাদিত হলো। সাধারণভাবে এই দুটি ইউনিট ভারত সরকারের নিজের আইন, নিউক্লিয়ার শক্তি দায়বদ্ধতা আইন-এর আওতায় আসার কথা। অর্থাৎ দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় বর্তাবে রোশ-এটমের ওপর। কিন্তু যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি লোকসভা নির্বাচনের সমাপ্তির আগেই সম্পাদিত হবে, তাতে দুর্ঘটনার দায় বহন করবে ভারত সরকার। ২০১০ সালে যে ভারত-রুশ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তাতে দুই দেশের সরকার মেনে নিয়েছে যে রোশ-এটম ভারতকে ১৪-১৬টি নিউক্লিয়ার চুল্লি সরবরাহ করবে। চুক্তি মতে ২০১৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে শেষ চারটি চুল্লি বসার কথা।

ভারত সরকার, ভারতীয় বিমা সংস্থা জেনারেল ইনসিওরেন্স মারফত রাশিয়াকে একটি প্রস্তাব দিয়েছে, যার ফলে দুর্ঘটনা ঘটলে ভারতীয় আইন মতে পুরো ক্ষতিপূরণ দেবে এই সরকারি সংস্থাটি, কিন্তু বিমার কিস্তি কত হবে তা নির্ধারণ করবে রাশিয়ান সংস্থা রোশ-এটম! আর যদি বিমাকৃত সময়সীমার মধ্যে দুর্ঘটনা না ঘটে, তবে ভারতীয় আইন অনুসারে বিমার কিস্তি হিসাবে যে টাকাটা জেনারেল ইনসিওরেন্সের প্রাপ্য হতো, ভারতীয় সংস্থাটি সেই পরিমাণ অর্থ রোশ-এটমকে দিয়ে দেবে। এই চুক্তির ফলে রাশিয়ান সংস্থা রোশ-এটমের নিউক্লিয়ার শক্তি দায়বদ্ধতা আইনের ১৭(খ) ধারা মেনে চলার বাধ্যবাধকতা রইল না— যে ধারা মতে যে চুল্লি সরবরাহ করছে ও চালাচ্ছে তার ওপরই দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের দায় বর্তায়।

ভারত সরকার অন্য দেশগুলির সঙ্গে যে সব দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করে, তার সঙ্গে একাধারে সাধিত হয় সেনাবাহিনীর যৌথ

মহড়া এবং প্রতিরক্ষা বিষয়ক সামগ্রী ক্রয়। রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তিও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রতিরক্ষা সামগ্রী কেনা ছাড়াও, নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদনের যন্ত্রাংশ, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন মারফত সস্তায় রাশিয়ায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ইত্যাদি। এছাড়া 'ব্রহ্ম' প্রজাতির ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে যে ১৫ বছরের চুক্তি ছিল, তার সময়সীমা অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়ানো হয়েছে।

রাশিয়ার সঙ্গে এই বাণিজ্য বিষয়ে আমরা দুটি বিষয় বেছে নেব আলোচনার জন্য। প্রথম, কোদানকুলম নিউক্লিয়ার চুল্লির নতুন দুটি ইউনিটের যন্ত্রাংশ সরবরাহের বিষয়টি। দ্বিতীয় ইউনিটে রোশ-এটমের একটি সহযোগী সংস্থা কিছু গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ সরবরাহ করে। কোদানকুলমে অবস্থানকারী রাশিয়ান বিশেষজ্ঞরা সেই যন্ত্রাংশ নিম্নমানের বলে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু ভারতীয় প্রযুক্তিবিদদের চাপাচাপিতে সেই যন্ত্রাংশ ব্যবহার করায় প্রথমবার জাতীয় শক্তিচক্র 'ট্রিপ' করে যায় (অর্থাৎ শক্তি সরবরাহ শোচনীয়ভাবে ব্যাহত হয়)। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটি যন্ত্রাংশ ও ইমারতি নির্মাণ ভেঙ্গে পড়ে, ফলে দ্বিতীয় ইউনিটটি বেশ কয়েক মাসের জন্য অকেজো হয়ে যায়। কয়েক মাস পরে, রোশ-এটমের সেই সহযোগী সংস্থাটির অন্যতম মালিক নিম্নমানের পণ্যকে 'উৎকৃষ্ট পণ্য' ছাপ মেরে বিক্রি করার অপরাধে রাশিয়াতেই গ্রেপ্তার হয় এবং অপরাধ প্রমাণিত হয়ে তিনি এখন ৩৫ বছরের মেয়াদে কারাগারে। কোদানকুলমের ৩ এবং ৪ নং ইউনিটের প্রস্তাবিত যন্ত্রাংশ আসবে সেই একই সহযোগী সংস্থা থেকেই— সংস্থার দ্বিতীয় মালিক সেই যন্ত্রাংশ উৎপাদন করছেন গ্রেপ্তার হওয়া মালিকের কারখানাটিকে ব্যবহার করেই!

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো সামরিক সরঞ্জাম সংক্রান্ত। রাশিয়ান যুদ্ধ-বিমান ও যুদ্ধ-জাহাজ ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য অকেজো বলে সেনাবাহিনীর পরিদর্শক দল সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারকে তা জানিয়ে দেয়। কিন্তু সেই সুপারিশ উপেক্ষা করে ভারত সরকার বিমান ও জাহাজ কেনে। ভারত-মার্কিন যৌথ সেনা মহড়ার সময় প্রমাণিত হয় যে রাশিয়ান যুদ্ধ-বিমান প্রত্যাশিত মানের অনেক নিচে এবং তা ভারতের নিজস্ব বিমানের চেয়ে নিকৃষ্ট। অথচ একটি রাশিয়ান বিমানের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ তিনটি ভারতীয় বিমানের রক্ষণাবেক্ষণের খরচের সমান, আর যন্ত্রাংশ আনতে হয় রাশিয়া থেকে। অপেক্ষার সময় সর্বনিম্ন তিন সপ্তাহ। আমদানিকৃত যন্ত্রাংশের ১৫ শতাংশ আবার কাজ করে না!

রাশিয়ার জাহাজ অ্যাডমিরাল গোরসকভ নিয়ে কেলেংকারি ভারতের সব কেলেংকারিকে হার মানিয়েছে। জাহাজটি চলে না, সেনাবাহিনী তা ব্যবহার করে না। সম্প্রতি এই জাহাজ কেনা নিয়ে প্রতিরক্ষা বিষয়ক সর্ববৃহৎ 'কিক্‌ব্যাক' বিষয়ে তদন্ত চলছে।

সব মিলিয়ে এই ভারত-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ভারতের জন্য অশনি সংকেত বহন করছে। ভোট মিটলে আমাদের ভাগ্যে আরও কী কী সাংঘাতিক সব বিষয় অপেক্ষা করছে, তা কে জানে!

সমরেশ মিত্র

কৃষিতে নয়া আক্রমণ

২০০৬ সালে যখন ভারত মার্কিন পরমাণু চুক্তির পাশাপাশি 'কৃষি জ্ঞান উদ্যোগ' নামক সর্বনাশা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তখনই আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম (*অনীক*, মে ২০০৬) যে আমাদের কৃষিক্ষেত্রে মার্কিন তথা সমগ্র বিশ্বের বহুজাতিক দস্যু-সংস্থাগুলির জন্য 'উদ্যোগের' দ্বার উন্মুক্ত হলো।

মাঝখানে কিছুদিন আর্থিক টালমাটাল, ব্যাপক দুর্নীতি, এবং নানান কারণে কেন্দ্রের ইউপিএ-২ সরকার মার্কিন প্রভুদের কৃষিক্ষেত্রে 'আবদার'-কে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারেননি। কিন্তু ভোটের বাজনা বেজে ওঠায় এবং কর্পোরেট ভারতের মোদী-র দিকে ঝুঁকে পড়ার লক্ষণ স্পষ্ট হওয়ায় মনমোহন-সোনিয়া জুটি নতুন উদ্যোগে 'কৃষি জ্ঞান উদ্যোগ'-এর বকেয়া শর্ত পূরণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

২০১৪-১৫ আর্থিক বছর থেকে কর্পোরেট ভারত কর, আমদানি, বিদেশি মুদ্রা ইত্যাদি বিষয়ে বর্ধিত হারে ছাড় পেলেও এই বছরের খরিফ মরশুম থেকে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি শস্য বিমায় যে ভরতুকি দিত, তা প্রত্যাহার করে নিল। বস্তুত, 'কৃষি জ্ঞান উদ্যোগ' সংক্রান্ত চুক্তির একটি ধারাই ছিল যে ভারতের কৃষিকে 'প্রতিযোগিতামূলক' করে তোলার প্রথম পদক্ষেপ হবে ক্রমাগত ভরতুকি প্রত্যাহার। দেশের সংসদকে এড়িয়ে গিয়ে দেশদ্রোহী এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তির প্রথম দফা লোকসভা নির্বাচনের আগেই এইভাবে রূপায়ণ করে ইউপিএ-২ সরকার মার্কিন প্রশাসন ও বহুজাতিক কৃষি ব্যবসা সংস্থাগুলিকে ভারতকে তাদের মৃগয়াক্ষেত্র করে তোলার সবুজ সংকেত দিল।

ভারতের কৃষির সর্বনাশের এখানেই শেষ নয়। শস্য বিমা করার ক্ষেত্রে যে ঝুঁকি থাকত তাতে সরকার জামিনদার হওয়ায় বিমার কিস্তির পরিমাণ কৃষকের সাধ্যের মধ্যে থাকত। কিন্তু কৃষক হত্যার নীল নকশা যে 'কৃষি জ্ঞান উদ্যোগ', সেখানে বাজারই নিয়ন্তা। অতএব এখন থেকে শস্য বিমার কিস্তির পরিমাণ ঠিক হবে বাজার দরে। কৃষক যদি সেই পরিমাণ কিস্তি দিতে অপারগ হয়, তবে দেশের সরকার নয়, বিদেশি ঋণদান

সংস্থাগুলো বহুজাতিক কোম্পানির মাধ্যমে কৃষককে দাদন দিয়ে চুক্তি-চাষে বাধ্য করতে পারবে। অর্থাৎ যে বিমা ক্ষেত্রটি এতদিন রাষ্ট্রীয় আওতায় ছিল, কৃষি ক্ষেত্রের মতো একটি বুনিয়াদি এবং গুরুত্বপূর্ণ লগ্নি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিদেশি বিনিয়োগ, অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত মুনাফা নিশ্চিত করল দেশের নির্বাচিত সরকার।

কবি শেলি সেই কবেই বলে গেছেন, শীত এসে গেলে বসন্তের আগমন কি আর বিলম্বিত হতে পারে! পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের নীল-সাদা সরকার, কেন্দ্রীয় সংস্থা, এগ্রিকালচারাল ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনকে এড়িয়ে গিয়ে কৃষকদের জন্য শস্য বিমা প্রকল্পে বেসরকারি বিমা সংস্থাগুলিকে সামিল করার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করে দ্রুত বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিয়েছে। যাতে এই নিয়ে দেশজোড়া আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে, সেদিকটি খেয়াল করে কেন্দ্র ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার সমস্ত বিষয়টি অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে কাজটি সমাধা করবে। খরিফ চাষ মূলত বর্ষাকালীন চাষ— অর্থাৎ জুন মাসে বর্ষা আসার পর কৃষকরা বুঝতে পারবেন তাঁদের চাষের অবস্থা কেমন হতে পারে। কিন্তু সরকার বলছে যে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যেই কৃষি শস্য বিমা প্রকল্পে নামভুক্ত করার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, ১ আগস্ট থেকে কৃষকরা কৃষি ঋণ মঞ্জুরের কাগজপত্র হাতে পেয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে পাঁচটি বেসরকারি বিমা সংস্থা, যারা একেবারে নতুন এবং এখনও পর্যন্ত কোনও বিমাকারীকে তাদের প্রাপ্য অর্থ ফেরত দিতে হয়নি। এহেন সংস্থাগুলি জেলায় জেলায় শস্যবিমা করার জন্য কী পরিমাণ কিস্তি পড়বে তার হিসেবও পেশ করে বসে আছে। যে রাজ্য সরকার ‘টেট’ পরীক্ষার মতো একটি দীর্ঘদিনের পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তিতে বার বার ভুল করে আবেদনকারীদের ক্রমাগত হয়রান করে চলেছে, সেই সরকারই নির্ভুল ইংরাজি ও বাংলায় বিধিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে ২০টি জেলার জন্য বিভিন্ন কিস্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন শস্যবিমার কাজ মাত্র পাঁচ দিনে সম্পন্ন করে সমস্ত কিছু প্রস্তুত করে রেখেছে। সমগ্র প্রক্রিয়াটি ১৭ মে ২০১৪-য় পূর্ণ গতিতে চালু হবে।

কৃষিবিমার বেসরকারিকরণের সুপারিশ ছিল বর্তমান ‘উদারনীতিবাদ’-এর পিতামহ মার্কিন দেশের পার্কার কমিশন ও তার জনক লাদেজিনস্কি-র সুপারিশ। সঙ্গে ছিল প্রথম প্রজন্মের তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তি গ্রহণের সুপারিশ। ১৯৬৬ সালে সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তি লাল বিপ্লবকে কিছুটা স্তিমিত করলেও সবুজ বিপ্লব ধূসর বিপ্লবে পর্যবসিত হয়েছে এবং দেশব্যাপী খাদ্যশস্যকে অগ্নিমূল্য করে তুলেছে। ভারত সরকার ফোর্ড ফাউন্ডেশনের পার্কার ও লাদেজিনস্কি নামক এই দুই ‘বিশেষজ্ঞ’-র যাবতীয় পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে দেশটিকে প্রায় বিকিয়ে দিয়ে, ভারতের সাত-সাতটি রাজ্যকে সাব-সাহারা আফ্রিকার মতো স্থায়ী ক্ষুধার রাজ্যে পরিণত করেছে। এখন আবার কৃষিবিমা সংক্রান্ত এই সুপারিশটি কার্যকর করে ভারত সরকার এদেশের কৃষির ও কৃষকের মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর দিল।

সহদেব মণ্ডল

অন্যায় যারা সহে

পশ্চিম বাংলার নাগরিক সমাজের মেরুকরণের একটা পর্যায় শেষ হল। গ্রামশ্চি কথিত অরাজনৈতিক ‘সিভিল সোসাইটি’, যারা জনসাধারণের সামাজিক রাজনৈতিক চেতনার উপর প্রভাব বিস্তার করেন তাদের মধ্যেও বিভাজন ঘটলো ‘পক্ষ’ অবলম্বনের প্রশ্নে। কেননা রাজ্যে শাসকের দল পরিবর্তনের সাথে সাথেই সুশীল সমাজের ভূমিকারও বদল ঘটল! যে সুশীল সমাজ বদ্ধনীবদ্ধ মার্কসবাদী তকমা লাগানো দলতান্ত্রিক-প্রশাসনিক-রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মানুষের উঠে দাঁড়ানো আর তার প্রতিবাদ-প্রতিরোধ নিয়েই সোচ্চার হয়েছিল তাদেরও বদল ঘটল। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের অমানবিক-বীভৎস রাষ্ট্রীয় ও দলীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে যারা নাম না জানা অখ্যাত মানুষজনের সাথে পায়ে পা মিলিয়ে ছিলেন তাদের একটি অংশ বিধানসভার নির্বাচনের পর শাসকবর্গ পরিবর্তনের সাথে সাথেই ধরে নিলেন যে অন্যায়কারীরা বিদায় নিয়েছে, তাই অন্যায়ের দিনও শেষ হয়েছে। পরিবর্তনকামী মানুষেরা পরিবর্তন পেয়েছেন, তাই রাজ্যের প্রশাসনে দলতন্ত্রের অবসান ঘটবে, শেষ হবে পুলিশ ও সরকারী দলের যৌথ অভিযান, থাকবে বাক স্বাধীনতা, হবে অবাধ নির্বাচন, হবে দুর্নীতির শেষ এবং অবশ্যই হবে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি— আরো অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে!

সুশীল সমাজের অনেকেই তাই ‘এখন আর দেরী নয়’ বলে নতুন দিনের আহ্বানে ক্ষমতার অলিন্দে ঢুকে পড়লেন। কেউবা শিক্ষামন্ত্রী, কেউ বা বাংলা একাডেমীর সভাপতি, আবার কেউ বা চলচ্চিত্র উৎসব কমিটির প্রধান, ইত্যাদি ইত্যাদি। কেননা এখন আর অন্যায় সহার কালো দিন নেই, আছে শুধু পুনর্গঠন। তাই যে অভিনেত্রী-নাট্যকার জর্জ অরওয়েলের ছোট্ট উপন্যাস ‘এনিম্যাল ফার্ম’ অবলম্বনে করা নাটক ‘পশুখামার’-এর শো বাম জমানায় বন্ধ করে দেবার জন্য যথার্থ অভিযোগ তুলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ হচ্ছে বলে প্রতিবাদী অন্যান্য নাট্যব্যক্তিত্বদের নিয়ে জোট বেঁধেছিলেন এবং যিনি সিঙ্গুর-

নন্দীগ্রামের ঘটনায় আলোড়িত হয়ে কলম ধরেছিলেন এবং একটি দৈনিক সংবাদপত্রে নিয়মিত বাম জমানার নানা সন্ত্রাসের ঘটনা নিয়ে প্রতিবেদন লিখেছিলেন তিনি অতিদ্রুত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমীর সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। অবশ্য এর আগে প্রখ্যাত লেখক জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্ত মহাশ্বেতা দেবী বাংলা একাডেমীর সভাপতিত্ব ছেড়েছিলেন রাজ্য সরকারের দেওয়া বিদ্যাসাগর পুরস্কারের জন্য তাঁর মনোনীত লেখককে একাডেমীর অন্য সদস্যরা বাতিল করে দেবার অভিযোগে!

আর পরিবর্তনের দিনগুলি যে কত ভয়ংকর হতে পারে, সিপিএম রাজত্বের সন্ত্রাসময় দিনগুলির চেয়ে কতটা নির্মম ও দলতান্ত্রিক হতে পারে তা বোধহয় কল্পনাতেও ছিল না। যদিও এখন 'মাইল মাইল শান্তির কল্যাণ' দেখতে পাচ্ছেন সেই সুশীল সমাজের নাট্যকার শিল্পী লেখক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। ফলে বাম জমানার বিষমদে মৃত্যুর মতোই সংগ্রামপুরের ঘটনায় 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকারের সামনে দু-শতাধিকের মৃত্যু হলেও রাজ্যের মুখ্য প্রশাসক মমতা ব্যানার্জী তৎপর হলেন না, দোষী বেআইনি মদপ্রস্তুতকারককে না ধরে প্রথমেই বিষমদে মৃতদের পরিবারকে অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ধরা পড়া মদপ্রস্তুতকারক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ না থাকায় কোর্ট বেকসুর খালাস দিয়েছে। কিংবা মনে করুন না, *আমরি* হাসপাতালের আগুনে ৯০ জনের মৃত্যুর ঘটনার কথা, যে ঘটনায় এখনো কোনো দোষী নির্ণয় হয়নি। দীর্ঘসূত্রতার চক্রে ঐ হাসপাতালের মালিক গোষ্ঠী একদিকে যেমন শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন, অন্যদিকে ঐ হাসপাতালটিতে পুনরায় কাজ শুরু করার সম্মতিও তারা জোগাড় করেছেন। এইসব ঘটনা বা প্রতিটি কলেজে ছাত্র নির্বাচন নিয়ে যে দুষ্কৃতিবাজদের একতরফা শাসন চলছে তাতে একদিকে যেমন স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের মদত আছে, তেমনই পরিচ্ছন্ন প্রশাসনের আশ্বাস দেওয়া মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে ঐসব দুষ্কৃতিকারী ছাত্র যুবকদের 'দুষ্টু ছেলে' বলে আসলে বাহবা দিচ্ছেন তাতে পরিষ্কার হয়েছে যে বাম আমলের হার্মাদ বাহিনীর মতই মা-মাটি-মানুষের ভৈরববাহিনী তৈরি হয়েছে নতুন ফ্যাসিস্ট দল হিসেবে এ রাজ্যকে গণতন্ত্রহীন-প্রতিবাদহীন করে রাখতে, ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খাঁচায় আটকে রাখতে!

প্রশ্ন জাগে, এইসময় সেইসব সংবেদনশীল সুশীল সমাজের সদস্যরা কী করছেন। সারা দেশের ক্রাইম রেকর্ড অনুযায়ী বিগত বাম জমানার শেষভাগে ২০১১ সালে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের সংখ্যায় এ রাজ্য সবার চেয়ে এগিয়ে ছিল। পরবর্তী বছরে পার্কস্ট্রীটের ধর্ষণের ঘটনা থেকে শুরু করে একের পর এক ধর্ষণ ও কামদুনিতে যে নৃশংস ধর্ষণ-হত্যার ঘটনা হলো যার শেষ আজও হয়নি। বীরভূমের লাভপুরে আদিবাসী মহিলার গণধর্ষণের ঘটনায় সুপ্রিমকোর্টও সংবেদনশীল হয়ে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে। কিন্তু সংবেদনশীল সুশীল সমাজ সদস্যরা চুপচাপ থেকেছেন। কারণটা 'আমাদের সরকার'-এর যা কাজ তা সবই জনগণের স্বার্থে!

এ এক অদ্ভুত আঁধার ভরা রাজ্য! সরকারের কোন কাজের সমালোচনা করলে সে বা তারা হল সিপিএম এবং/অথবা মাওবাদী! স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী যিনি জনগণের দুঃখের আন্দোলনের ভাগীদার হতে ধর্মতলায় ২১ দিন অনশনে বসেছিলেন, যিনি নন্দীগ্রামের গণহত্যার প্রতিবাদে ছুটে গেছেন ঘটনাস্থলে, যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জঙ্গলমহলে শান্তি ফেরাতে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার হবে পরিবর্তনের সরকার আসার পর, যিনি বলেছিলেন প্রশাসনে দলতন্ত্রের বদলে আসবে 'গণতন্ত্র', বলেছিলেন 'বদলা' নয় 'বদল' চাই, তিনিই রাজ্যে ব্যাপক নৈরাজ্যের, গণতন্ত্রের স্থানে একনায়কতন্ত্র, স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা কায়েম করলেন, যখন দলীয় মন্ত্রীরা লুম্পেনদের ভাষায় কথা বলবে, দোষীরা পুলিশের সমর্থন পাবে।

কী বলবেন আজ শাঁওলী মিত্র, যিনি 'ত্রিশ বছরের বাম শাসনের অভিজ্ঞতা' নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন— ''দলীয় ক্ষমতা প্রদর্শনের সবচেয়ে প্রশস্ত ক্ষেত্র হল নারী নির্যাতন। শুনেছি সেই সমাজই সভ্য সমাজ যে সমাজে নারীর মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে।... এঁদের কাউকে (অর্থাৎ বাম সমর্থক মহিলা বুদ্ধিজীবীরা) তাপসী মালিকের ঘটনার পরে বা নন্দীগ্রামে মেয়েদের ওপরে অত্যাচারের পরে রাস্তায় নামতে দেখিনি।'' কিন্তু পরিবর্তনের সরকারের আমলে যখন একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা ঘটে চলেছে আর অন্যায়কারীরা দিব্যি পুলিশের সাথে সখ্য করে ঘুরে বেড়াতে পারছে গ্রামে-গঞ্জে-শহরে তখন তিনি নীরব কেন!

২০০৭ সালে তিনি ড. বঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জী স্মারক বক্তৃতাতে বলেছিলেন ''যে সমাজে অন্যায়কারীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে, ভ্রষ্টাচারীরা সম্মানিত হয়, মাত্রাতিরিক্ত মূল্য পায়, খুন করেও গরম গরম রাজনৈতিক বক্তৃতা দিতে যে সমাজে অসুবিধা হয় না— সেই সময় এবং সেই সমাজ নিঃসন্দেহে খারাপ।'' বর্তমান সরকারের আমলে কি এই অবস্থার বদল ঘটেছে? বরং অন্যায়কারীরা ধর্ষণ করে, শিক্ষকদের পিটিয়ে, অধ্যক্ষকে গালিগালাজ ও খুন করতে চেষ্টা ক'রে, কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারি করে দিব্যি তো ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই 'অন্যায় না সহ্য' নাট্যকার সমাজ-সচেতন প্রবন্ধকার এখন বাংলা একাডেমীর সভাপতি পদে আসীন থেকে নীরবে রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশে খুবই ব্যস্ত। তিনি সময়-উপযোগী কোন নাটক আর খুঁজে পাচ্ছেন না। ওদিকে ধর্ষণের ঘটনা নিয়েই নাট্যকার উষা গাঙ্গুলীর 'রঙ্গকর্মী' নাটক করছে 'হাম মুখতারা'।

আবার নন্দীগ্রামের ঘটনার পর সংবেদনশীলদের সাথেই

ঘটনাস্থলে গিয়ে ছিলেন খ্যাতিমান এক কবি যিনি '৯৭ সালের জেহানাবাদে লক্ষণপুর-বাথে গ্রামের নারকীয় দলিত গণহত্যাকাণ্ডের স্মরণে লিখেছিলেন 'মৃত্যুর পর মৃত্যু পেরিয়ে' প্রবন্ধটি। সংবেদনশীল এই প্রবন্ধটি পুনঃপ্রকাশিত হয় নন্দীগ্রামের গণহত্যা উপলক্ষ্যে, কেননা 'সমস্ত আক্রান্ত মানুষ একটাই জাত'! সেই প্রথিতযশা কবি ছুটে গেছেন অনেক বুদ্ধিজীবী লেখক শিল্পীদের সাথে নন্দীগ্রামের পথে, তার পরেই প্রকাশিত হয়েছে সেই কবিতাগুচ্ছটি, 'শাসকের প্রতি'। রাষ্ট্রীয় ও দলীয় সন্ত্রাসের হিংস্র মুখ রাজ্যের মানুষ যেমন দেখছিল তেমনই সেই কবিও তা উপলব্ধি করে যে কবিতাগুলি লিখেছিলেন সেগুলি সমাজসচেতন একজন মানুষের প্রতিবাদের ভাষা হিসাবেই চিরকাল উচ্চারণ করবে সবাই। কিন্তু পালাবদলের পর কবি জয় গোস্বামীর ভূমিকা কী! নয়া স্বৈরাচারী শাসকদল একদিকে প্রতিটি প্রতিবাদী স্বরের গলা টিপে ধরছে, সন্ত্রস্ত করে, প্রয়োজনে 'মাওবাদী' ছাপ্পা মেরে ভুয়ো পুলিশ কেস দিয়ে এবং একই সাথে ঠিক করছে কোন সংবাদপত্রগুলি সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারে থাকবে আর কোনগুলি বাদ যাবে। রাজ্যে ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ঘটনাগুলিকে সাজানো ঘটনা বলে বিবৃতি দিয়ে সেগুলির গুরুত্ব কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে দিনের পর দিন। এই অন্ধকারময় সময়ে কবির তো নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর সময়, কেননা কবি হলেন সত্যদ্রষ্টা! কিন্তু সংবেদনশীল সেই কবি ক্ষান্ত থাকলেন রাজ্যের নজরুল-একাডেমীর সভাপতির পদটি গ্রহণ করে। কেননা, এই সময় তাঁর কাছে নীরবতাই স্বর্ণময়। তাই জেহানাবাদের ৬১ জনের গণহত্যার জন্য দায়ী রণবীর সেনার ২৮ জন যখন পাটনা হাইকোর্টের রায়ে বেকসুর মুক্তি পেয়ে যায় তখন কোন প্রতিবেদন বা প্রতিবাদী কবিতা আর বেরোয় না এই কবির কলম থেকে।

আর একই সাথে বেদনার সঙ্গে মনে করতে হয় বিবেকবান বিদ্বজ্জনের পুরোধা সেই মহাশ্বেতাদেবীর কথা! যিনি প্রায় সারা জীবন ব্যয় করেছেন দেশের আদিবাসী মানুষদের জীবন-যাপনের উন্নতিকল্পে, তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরোধিতায়। যিনি বিদেশি ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে জঙ্গলমহলের বিরসা মুন্ডার লড়াইয়ের কাহিনী অবলম্বনে লিখেছিলেন 'অরণ্যের অধিকার', আবার সত্তরের পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন 'হাজার চুরাশির মা'। 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার প্রাপ্ত এই লেখিকা রাজ্যের সরকারি সন্ত্রাস ও অপশাসনের বিরুদ্ধে বারবার এগিয়ে এসেছেন। বিশেষত রাজ্যের রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির ব্যাপারে পরিবর্তনের সরকার আসার পরও তিনি সোচ্চার হয়েছেন। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনকারীদের রাস্তায় মিটিং করার অধিকারটুকুও এই সরকারের আমলে কেড়ে নেওয়া হলে বা সরকারি-সাহায্যপ্রাপ্ত পাঠাগারে রাখা কিছু পত্রিকার নাম সরকার অনুমোদন না করায় তিনি এই সরকারকে 'ফ্যাসিস্ট' আখ্যা দিয়েছিলেন। এই লেখিকা রাজ্য বাংলা একাডেমীর সভাপতিত্ব ত্যাগ করেছিলেন তার মনোনীত বই বিদ্যাসাগর পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত না করায়। পরিবর্তনকামী বুদ্ধিজীবী, সিভিল সোসাইটির অন্যতম মুখ এই লেখিকা কামদুনি গণধর্ষণের ঘটনাতেও প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু পরিবর্তনের সরকার যে জঙ্গলমহল থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহৃত করেনি বা নিয়মিতভাবে মূলত আদিবাসী যুবক-যুবতীদের বা গণআন্দোলনের কর্মীদের নানা অজুহাতে ও 'মাওবাদী তকমা' দিয়ে বন্দি করে রেখেছে, গণ আন্দোলনের নেতা ছত্রধর মাহাতো সহ অন্যান্য অনেক দরিদ্র আদিবাসী আন্দোলনকারীকে নানা কেসে বন্দি করে হয়রানি করে চলেছে, তার প্রতিবাদে তিনি বারবার সোচ্চার হলেও গত ৩০ জানুয়ারি ময়দানে তৃণমূলের নির্বাচনী সমাবেশে তিনিই আবার মুখ্যমন্ত্রীকে ঢালাও প্রশংসা করলেন। মমতাকে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চান! কেননা, মমতা দুর্বলতর শ্রেণীর উন্নতির জন্য চেষ্টা করছেন, এমনকি আদিবাসীদের জন্যও তাঁর অবদান যথেষ্ট! তিনি জঙ্গল মহল, দার্জিলিং-এর অশান্তির জায়গায় শান্তি ফেরাতে যা যা করেছেন তা তুলনারহিত! কাজেই প্রধানমন্ত্রী হবার যোগ্যতা মমতারই আছে!

ভাবুন, এর কিছুদিন আগেই বীরভূমের লাভপুর গ্রামে আদিবাসী যুবতীর ওপর গণধর্ষণ হয়েছে পঞ্চায়েত প্রধানের উপস্থিতিতে, যে প্রধান আবার তৃণমূল সদস্য। এরপরও মমতাকে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী সেই লেখিকা যিনি লাভপুরের ঘটনাকে বলেছেন, 'রেয়ারেস্ট অফ রেয়ার'!

উদাহরণ আরো বিস্তৃত না করে বলা যায় যেসব বুদ্ধিজীবী সুশীল সমাজের মানুষজন পরিবর্তনের জন্য রাস্তায় নেমেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই এখন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ভুলে গেছেন। বাম আমলের সরকারি পৃষ্ঠপোষক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মতই সরকারি কোন একাডেমী বা কোন উন্নয়ন দপ্তরের প্রধান বা মন্ত্রীপদ পুরস্কার পেয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, দলতন্ত্র, সরকারি স্বেচ্ছাচারী নির্দেশ ইত্যাদি অগণতান্ত্রিক কাজগুলির বিরোধিতা করাটাই অন্যায় মনে করছেন। অর্থাৎ সেই সব বিবেকবান মুখগুলি ছিল অনেকের মুখোশ, এখন আমরা তাদের মুখোশ ছাড়া মুখগুলি দেখতে পাচ্ছি।

তাই এসময়ে রবীন্দ্রনাথের সেই অমোঘ নির্দেশ আবারো মনে পড়ে—

অন্যায় যে করে আর
অন্যায় সে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

তড়িৎ চৌধুরী

প্রবন্ধ

স্বাস্থ্যনীতি, ওষুধ কোম্পানির মুনাফা আর ছাঁটাই

শুভজিৎ বসাক

ভারতের সংবিধানে স্বাস্থ্যকে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি না দিলেও, নৈতিক দায়িত্ব (ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল) হিসেবে মেনে নেওয়া হযেছে। ইউনিসেফ ও হু-র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আটলান্টার আন্তর্জাতিক সভায় ১৩৪টি দেশের উপস্থিতিতে ভারত অঙ্গীকার করে '২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য', কিন্তু তা ফলপ্রসূ করার কোন চেষ্টা এতদিনেও আমরা দেখতে পাইনি। ভারতের প্রথম জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে [Article 3(7)] সরকারি ব্যয়বরাদ্দ দ্রুত কমানোর সাথে সাথে বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাতে ছেড়ে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছিল। অথচ দেশের সর্বোচ্চ আদালতের ডিভিশনাল বেঞ্চ ১৯৮৯ ও ১৯৯৯ সালে যথাক্রমে 'অসুস্থ রোগির চিকিৎসা পাওয়ার অধিকারকে মৌলিক অধিকার' এবং সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বিনা পয়সায় চিকিৎসা পাবার অধিকারকে মান্যতা দেয়। কিন্তু রাষ্ট্র ব্যবস্থা সেই রায়কে ফুৎকারে উড়িয়ে নিয়ে দ্বিতীয় জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে (Para 4-42) ইউনিফর্ম চার্জ-এর নামান্তরে স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেসরকারিকরণকে পাকা করে। এই ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করতে সরকার 'পিপিপি' মডেল চালু করে। ফলে বিগত রাজ্য সরকারের আমলে আমরা দেখলাম সরকারি হাসপাতালে প্যাথলজি বিভাগের বেসরকারিকরণ, এবং বর্তমান সরকারের আমলে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানের আবির্ভাব। অথচ বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার অঙ্গীকার রাষ্ট্রব্যবস্থা করেছিল।

স্বাস্থ্যব্যবস্থায় যেমন মনোপলি ক্যাপিটালের দাপট চলছে তেমন এর সঙ্গে জড়িত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 'ওষুধ শিল্পে' মনোপলি ক্যাপিটালের চরিত্রানুযায়ী একচেটিয়া বাজারিকরণের প্রচেষ্টাও ক্রমাগত চলছে। এবং এই একচেটিয়া বাজারিকরণের প্রচেষ্টায় এখন রাষ্ট্রব্যবস্থা খানিকটা কল্যাণকামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, বা কর্পোরেট পুঁজির মুনাফা কিছু সময়ের জন্য খানিকটা কমিয়েছে। কর্পোরেট পুঁজি তৎক্ষণাৎ তার প্রতিক্রিয়ায় শ্রমজীবী মানুষকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছে। উদারীকরণের এই যে সার্বিক নীতি রাষ্ট্রব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তার ফলস্বরূপ বারবার ছাঁটাই হয়েছে, বলি হয়েছে দেশের শ্রমজীবী মানুষ। রাষ্ট্রের কল্যাণকারী ভূমিকার ছাঁটাই হয়েছে, জল-জমি-জঙ্গলের অধিকার থেকে আদিবাসী মূলবাসীরা ছাঁটাই হয়েছে। বিভিন্ন অধিকার ছাঁটাই সহ বিভিন্ন ধারার ছাঁটাই অব্যাহত।

কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া নোভার্টিসে ১৮০ জন সেলস্ কর্মচারীর ছাঁটাইও বারবার চিৎকার করে সরকারি নীতির দৈন্য এবং কর্পোরেট পুঁজির একচেটিয়াকরণের স্পৃহার কথা বলছে, দাপটের কথা বলছে। আসুন, আমরা নোভার্টিসের ঘটনার দিকে একটু আলোকপাত করি এবং এই একটি উদাহরণের মধ্য দিয়ে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি ওষুধ শিল্পে মুনাফা ও একচেটিয়া অধিকারের অবস্থাটা।

প্রথমত, পাঠকের নিশ্চয় মনে আছে কিছুদিন আগেই সর্বাধিক প্রচলিত বাংলা সংবাদপত্রের খবরটি— ''আর এ দেশে আর এন্ড ডি (রিসার্চ এন্ড ডেভলপমেন্ট)-তে বিনিয়োগ করবে না নোভার্টিস''। *অনীক*-এর পাঠকরা এও জানেন যে এই বহুজাতিক সংস্থাটি অদ্ভূত, ওরা কীটনাশক বানায় যা ক্যানসার ঘটায়, আবার তা নিরাময়ের জন্য ওষুধও বানায়। এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ভারতে এই সংস্থাটির বিক্রি প্রায় বার্ষিক ৯৩৩ কোটি টাকা এবং আর এন্ড ডি-তে খরচের জন্য বরাদ্দ মাত্র ২৬ লক্ষ টাকা। যাইহোক, এই বহুজাতিক সংস্থাটির একটি ওষুধ হচ্ছে গ্লিভাক (ইমিটিনিব বিসাইলেট), যা একটি ব্লাড ক্যানসারের ওষুধ (সিএমএল বা ক্রনিক মায়লয়েড লিউকোমিয়া। এটি একটি জিন-ঘটিত ক্যানসার— ভারতবর্ষে যার প্রকোপ বেশি)। ওষুধটি দিনে দুবার খেলে অনেকদিন পর্যন্ত ভালো থাকা যায়। কিন্তু গ্লিভাক খেতে মাসে খরচ পড়ে ১.২০ লক্ষ টাকা। ১৯৯২-৯৩ সালে আবিষ্কৃত ওষুধটি ভারতে সেই সময়ে কোন পেটেন্ট পায়নি, কারণ তখন ভারতে পেটেন্ট আইনে 'প্রোডাক্ট' পেটেন্ট ছিল না, 'প্রসেস' পেটেন্ট ছিল। তখন গ্লিভাকের সল্টটি ছিল ইমিটিনিব অ্যামরফাস। ২০০৫ সালে নতুন পেটেন্ট আইন লাগু হওয়ার আগে তারা গ্লিভাকের সল্টটি পরিবর্তন করে আনে ইমিটিনিক বিসাইলেট। সংস্থাটি দাবি করে যে এটি একটি নতুন মলিকিউল এবং তারা পেটেন্টের দাবি জানায়। কিন্তু নতুন পেটেন্ট আইনে যে দুটি সুরক্ষা কবচ আছে তার একটির কারণে ভারতবর্ষের পেটেন্ট দপ্তর তাদের আর্জি খারিজ করে দেয়। তখন তারা চেন্নাই হাইকোর্টে কেস করে এবং সেখানেও তারা হেরে যায়। এবারে তারা সুপ্রিম কোর্টে কেস করে এবং সেখানেও হেরে যায়।

পেটেন্ট আইনে যে দুটি সুরক্ষা কবচ আছে তার মধ্যে 3D খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং যাতে বলা আছে, কোন নির্দিষ্ট মলিকিউলের সামান্য কিছু স্ট্রাকচারাল পরিবর্তন করে যদি সেটি আগের চেয়ে বেশি চিকিৎসাগত সুবিধা না দেয় তাহলে সেটি নতুন মলিকিউল হলেও সেটির উপর পেটেন্ট দেওয়া যাবে না। এই ক্ষেত্রে যে দুটি সল্ট-এর উল্লেখ্য করেছি (অ্যামরফাস এবং বিসাইলেট) তার দ্বিতীয় অর্থাৎ পরিবর্তিত রূপটি প্রথমটির তুলনায় একটু তাড়াতাড়ি বিশোষণ হয় মাত্র, কিন্তু আলাদা

চিকিৎসাগত সুবিধা বা থেরাপিউটিক বেনিফিট দেয় না। ফলে বহুজাতিক সংস্থার ফন্দি বাধাপ্রাপ্ত হয়। ভারতীয় একটি সংস্থা এই ইমিটিনিব বিসাইলেট মলিকিউলটি মাসিক ৫০০০ টাকায় বাজারজাত করেছে। সুতরাং নোভার্টিসের একচেটিয়া বাজারজাতকরণ এবং ব্যাপক মুনাফাতে বাধা পড়েছে। এটা ভাবার কোন কারণ নেই যে ভারতীয় সংস্থাটি মুনাফা করছে না। নোভার্টিসের তুলনায় তাদের মুনাফা অবশ্যই কম, কিন্তু বাস্তবে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের উপর হিসেব করলে দেখা যাবে যে সেখানেও প্রচুর মুনাফা। আরো কম দামে ওষুধটি পাওয়া যেত যদি রাষ্ট্রায়ত্ত ওষুধ সংস্থাগুলি এই ওষুধটি তৈরি করত। কিন্তু পুঁজির এজেন্ট বনে যাওয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা কখনোই এই রাষ্ট্রায়ত্ত ওষুধ সংস্থাগুলিকে চালু করার কোন উদ্যম দেখাবে না।

দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষে বিভিন্ন সংগঠনের চাপে বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অত্যাবশ্যক ওষুধের একটি তালিকা 'ন্যাশনাল লিস্ট অফ এসেনসিয়াল মেডিসিন' (এনএলইএম) প্রকাশ করেছে ২০১১ সালে। ভারতে ওষুধের দাম খানিকটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে নতুন ডিপিসিও (ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার) চালু হওয়ার ফলে। এতেই দেশি বিদেশি সংস্থাগুলি গেল গেল রব তুলেছে। কারণ তাদের প্রচুর মুনাফা কিছুটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এই অর্ডারে। এই ডিপিসিওটিকে আমরা একবার দেখে নেবো।

১৯৭৪ সালে জয়সুখলাল হাতি কমিটির সুপারিশে ১৯৭৮ সালে প্রথম জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি তৈরি হয় এবং ১৯৭৯ সালে একটি কার্যকর ডিপিসিও জারি হয়। চালু ওষুধের ৯০ শতাংশ ওষুধ অর্থাৎ ৩৭৪টি ওষুধকে ডিপিসিও-র আওতায় নিয়ে আসা হয় ৪টি ভাগে ভাগ করে এবং সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দেওয়া হয়। জীবনদায়ী ওষুধ, অত্যাবশ্যক ওষুধ, স্বল্প প্রয়োজনীয় ওষুধ ও অন্যান্য ওষুধের তালিকা প্রকাশিত হয় এবং উৎপাদন ব্যয়ের ৪০ থেকে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত মুনাফার হার নির্দিষ্ট হয়। এই নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিকা জারি হওয়ার পরেই সংস্থাগুলি গেল গেল রব তোলায় নতুন নির্দেশিকা জারি হয় যাতে ৩৭৪-র বদলে ১৪২টি ওষুধ নিয়ন্ত্রিত হয় যা ছিল চালু ওষুধের ৭০ শতাংশ। ৮০-এর দশকে ওষুধগুলিকে ৪টি ভাগের বদলে ২টি ভাগে ভাগ করা হয় এবং মুনাফা বেঁধে দেওয়া হয় ৭৫-১০০ শতাংশে। ১৯৯১ সালে নতুন সংস্কারমুখী অর্থনীতির প্রবর্তনের ফলে এবং বিশ্ব বাণিজ্যসংস্থায় অন্তর্ভুক্তির কারণে ওষুধ শিল্পে ব্যাপক প্রভাব পরে। ১৯৯৪ সালে নতুন ওষুধ নীতি তৈরি হয় এবং ১০ বছরের মধ্যে পেটেন্ট আইনের আইনি সংশোধন করতে হবে বলে শর্ত আরোপিত হয়। লাইসেন্স প্রথা ও আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ রদ, নিয়ন্ত্রিত ওষুধের সংখ্যা কমিয়ে ৭৪ (যার মধ্যে মাত্র ৪৯টির উপর নিয়ন্ত্রণ কার্যকরভাবে লাগু), থার্ড পার্টি দ্বারা উৎপাদনের স্বীকৃতি, বিদেশি বিনিয়োগ ৪০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫১ শতাংশ করা হয় (যা বর্তমানে ১০০ শতাংশ) এবং রাষ্ট্রীয় ওষুধ সংস্থাগুলির আকরিক ওষুধ একমাত্র তৈরি করার অধিকার কেড়ে নিয়ে সংস্থাগুলিকে দুর্বল করা হয়। নতুন ওষুধ নীতি অনুযায়ী ডিপিসিও-তে মাত্র ৩০ শতাংশ ওষুধ নিয়ন্ত্রণে রইলো এবং মূল্য নির্ধারণে উৎপাদন ব্যয়ের উপর ১০০ শতাংশ মুনাফা নির্দিষ্ট করা হলো এবং নতুন ওষুধ ১০ বছর মূল্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা হলো। ২০০৫ সালে নতুন পেটেন্ট আইন লাগু হয় যাতে অবশ্য ৩ডি এবং সিএল (কম্পালসারি লাইসেন্সিং) এবং ১৯৭০ সালের পেটেন্ট আইনের ৮৪ নং ধারা বলবৎ থাকে। এই ৩ডি কীভাবে আমাদের রক্ষাকবচ তা উপরে খানিকটা বর্ণনা করেছি। কম্পালসরি লাইসেন্সিং কীভাবে আমাদের রক্ষাকবচ তা পরে ব্যাখ্যা করা যাবে, শুধু এইটুকু বলে রাখি যে এর দ্বারা দেশের প্রয়োজনে মনোপলি ব্যবসা খানিক রোধ করা যায় এবং কম খরচে ওষুধ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। যাইহোক, ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ৭৪টি ওষুধের বাইরে সমস্ত ওষুধের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। ২০১০ সালে ৮টি নতুন ডিপিসিও-র তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে ৩১৮টি মৌল ওষুধ এবং ৬৫০টি ব্রান্ড ওষুধ আছে। এগুলির মূল্য নির্ধারিত হয় তালিকাভুক্ত যে কোন একটি ওষুধের যে সমস্ত ব্রান্ডের ৯ শতাংশের উপর বিক্রি, তার গড় হিসেব করে। এই নতুন ডিপিসিওতে আমরা দেখলাম বর্ধিত দামের ভিত্তিতে (১৯৯৩-২০২৫) নতুন মূল্য নির্ধারিত হলো। অনেক চালু ও প্রয়োজনীয় ওষুধকে এই তালিকার বাইরে রাখা হলো এবং কোন একটি ওষুধের নির্দিষ্ট স্ট্রেন্থকে নিয়ন্ত্রণে এনে অন্য স্ট্রেন্থকে দাম বাড়ানোর সুযোগ দেওয়া হলো (যেমন প্যারাসিটামলের ৫০০ মিগ্রা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে, কিন্তু ৬৫০ মিগ্রা নিয়ন্ত্রণের বাইরে)। স্বাভাবিকভাবে নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা ওষুধগুলির বিপণনে ব্যবসা বাড়বে। বর্তমানে এদেশের অভ্যন্তরীণ ওষুধের বাজার ৭৭ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। তার মধ্যে মাত্র ২০ শতাংশ মূল্য নিয়ন্ত্রণের অধীনে এলো। বাকী ৮০ শতাংশ ওষুধের দাম যথারীতি বাড়বে। সমীক্ষা অনুযায়ী এই নিয়ন্ত্রণের ফলে মাত্র ১৬০৬ কোটি টাকা মূল্য হ্রাস হতে পারে, যা মোট বাজারের ১.৮ শতাংশ। অথচ ন্যূনতম ১০ শতাংশ হারে প্রতিবছর এই নিয়ন্ত্রিত ওষুধের দাম বাড়ানো যাবে। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত ওষুধের ক্ষেত্রেও মুনাফা যেটুকু কমবে তা অচিরেই দূর হয়ে যাবে।

আমরা দেখলাম একদিকে নোভার্টিসের গ্লিভাকের পেটেন্ট না পাওয়া আর ডিপিসিও-র ফলে ওষুধের দাম কমার খেলা। আর এই দুই খেলাকে অজুহাত করে নোভার্টিস ছাঁটাই শুরু করেছে। তারা এই কারণ দর্শায়নি যে তাদের লভ্যাংশ কমেছে বা তাদের প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে, কিংবা কোম্পানি রুগ্ন— তাহলে তারা ভিআরএস চালু করত, কিন্তু তা তারা করেনি।

এর পর ৩৪ পৃষ্ঠায়

প্রতিবেশী দেশ

জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করা প্রসঙ্গে

বদরুদ্দীন উমর

গত বছর বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক প্রকাশ হিসাবে দেখা দিয়েছিল শাহবাগ বিক্ষোভ। সেই বিক্ষোভ ও মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যাকারীদের বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে সেদেশের সাম্প্রদায়িক ও চরম প্রতিক্রিয়াশীল জামায়েতে ইসলামীর বিরুদ্ধে জনমত দানা বাধে, অন্যদিকে গণহত্যাকারীদের ফাঁসির বিরোধিতায় জামায়েতে ইসলামীও বিক্ষোভে মাতে। কথা ওঠে জামায়েতে ইসলামীকে বেআইনি ঘোষণা করার। বিষয়টি, বলাবাহুল্য, সোজাসাপটা নয়। বাংলাদেশের বর্ষীয়ান রাজনৈতিক নেতা ও ভাষ্যকার এবং জাতীয় মুক্তি পরিষদের সভাপতি বদরুদ্দিন উমরের এই প্রবন্ধটি সেই বিষয়টি নিয়ে একটি রাজনৈতিক ভাষ্য।

চরম প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় রাজনৈতিক দল জামায়েতে ইসলামীকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে বর্তমান সরকার, তাদের দল আওয়ামী লীগ, তাদের ঘরানার বুদ্ধিজীবী মহল এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত লোকজন এখন তাদের একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে নিষিদ্ধ করা এবং আইন জারি করে তাদের তৎপরতা বন্ধের জন্য মরিয়া হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে জামায়েতে ইসলামীকে একটি জঙ্গি সংগঠন হিসেবে নিষিদ্ধ করা যতই প্রগতিশীল কর্ম মনে হোক, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিকভাবে এর থেকে বিপজ্জনক ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। কারণ এর দ্বারা জামায়াতে ইসলামীর তৎপরতা বন্ধের পরিবর্তে সারা দেশে ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতা ও ধর্মীয় জঙ্গি তৎপরতা ভয়ংকরভাবে শতগুণ বৃদ্ধি করার শর্তই তৈরি হচ্ছে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের জনগণকে যতই ধর্মের কথা শোনাক, তারা মূলত হল একটি রাজনৈতিক দল, যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল সব ধরনের গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও সমাজতান্ত্রিক চেতনা এবং সাংগঠনিক তৎপরতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দেশীয় শোষক-নির্যাতক ও সাম্রাজ্যবাদের খেদমত করা এবং তাদের অবস্থান টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে কাজ করা। এটা এক তর্কাতীত ব্যাপার যে, কোনো রাজনৈতিক শক্তির বিরোধিতা করা ও তাকে খর্ব, এমনকি তার প্রভাব নির্মূল করার একমাত্র পথ হল রাজনৈতিকভাবে তার মোকাবিলা করা। যে পাকিস্তান সরকার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর শোষণ-নির্যাতন চালিয়েছিল এবং সর্বশেষে ১৯৭১ সালে ব্যাপক গণহত্যা করেছিল, তাদের মোকাবেলাও জনগণ করেছিলেন রাজনৈতিকভাবে। রাজনৈতিকভাবে পরাজিত হওয়ার পরই তারা এ দেশ থেকে উৎখাত হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে তাদের সমর্থক রাজনৈতিক দল জামায়েতে ইসলামীও পরাজিত হয়ে বিলুপ্ত হয়েছিল। এভাবে বিলুপ্ত হওয়া জামায়েতে ইসলামী স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙালিদের শাসনে কীভাবে আবার একটি হিসাবযোগ্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিতে পরিণত হল, এটা এক অতি আবশ্যকীয় জিজ্ঞাসা। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে এই জিজ্ঞাসা কোথায়? এই জিজ্ঞাসার অনুপস্থিতি ও অভাব বাংলাদেশের গভীর রাজনৈতিক ও চিন্তাগত এক সংকটই নির্দেশ করে। কাজেই এটি কোনো উপেক্ষার বিষয় নয়। বাংলাদেশের মেধাহীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব তো বটেই, এমনকি বুদ্ধিজীবীদেরও চিন্তার যে দৌড়, তাতে তারা এই পরিস্থিতির জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে! শুধু তাই নয়, নিজেদের কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যেও তারা এই যুক্তি জনগণের সামনে উপস্থিত করে।

বাংলাদেশে বর্তমানে ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতা জামায়াতে ইসলামী এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের মাধ্যমে যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, এটা যদি সত্যিই পাকিস্তানিদের কাজ হয়ে থাকে তাহলে বাংলাদেশের বাঙালিদের উচিত, যে পাকিস্তানিদের এখান থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল তাদের বারবার সশ্রদ্ধ কুর্নিশ করা! কারণ এ দেশের শাসনক্ষমতায় থেকে ধর্মীয় রাজনীতি রক্ষা করতে না পেরে যারা উৎখাত হয়ে গিয়েছিল, তারা হাজার মাইল দূরে নিজেদের দেশে পালিয়ে যাওয়ার পর সেখান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত', 'দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ', 'জনগণের স্বার্থচিন্তায় নিমগ্ন', 'গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল' বাঙালি শাসক শ্রেণী ও তাদের প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ সহ অন্যান্য দলের প্রভাব রাজনৈতিকভাবে খর্ব করে যদি জামায়েত ইসলামীর মতো একটি বিপজ্জনক ধর্মীয় দলকে শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়ে থাকে, তাহলে তাদের কৃতিত্ব বিস্ময়করই বলতে হবে! বিশেষত আরও এ কারণে যে, তারা নিজেরাই এখন এমন সব অভ্যন্তরীণ সংকটের মধ্যে নিমজ্জিত যা সামাল দিতে তারা হিমসিম খাচ্ছে।

এটি এক সর্বজনবিদিত বিষয় যে, কোনো দেশে যখন বাইরের কোনো দেশ বা শক্তির হস্তক্ষেপ ঘটে, তখন তার সঙ্গে সেই দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত থাকে। কাজেই তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, পাকিস্তানিরাই বাংলাদেশে ধর্মের জিকির তুলে জামায়েতেকে ইসলামীকে শক্তিশালী করেছে, তাহলে এ অবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিরও বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। দেখতে হবে, ১৯৭১ সালের ঠিক পরই যেখানে ধর্মীয় রাজনীতির প্রভাব প্রায় বিলুপ্ত হয়েছিল, সেখানে ধর্মীয় রাজনীতির বৃদ্ধি-বিকাশের শর্ত বাংলাদেশে নতুন করে আবার

কীভাবে তৈরি হল এবং তার জন্য দায়ী কারা?

এর দায়িত্ব বাংলাদেশের নব্য বাঙালি শাসক শ্রেণী এবং তাদের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও শাসক শ্রেণীর অন্যান্য দল এবং তাদের ঘরানার বুদ্ধিজীবীরা কি এড়িয়ে যেতে বা অস্বীকার করতে পারেন? এর নানা দিক নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে এবং সে কাজ অবশ্যই করা দরকার। কিন্তু মোটা দাগে এ কথা বলা যায় যে, ১৯৭১ সালের পর থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেম, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতা ইত্যাদি নিয়ে অনেক ন্যাকামি ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে এলেও প্রথম থেকেই এ দেশের শাসক শ্রেণী ও তাদের দল আওয়ামী লীগ এমনভাবে দেশ পরিচালনা করে এসেছে যে অতি অল্পদিনের মধ্যেই স্বাধীনতা, শোষণ-নির্যাতন থেকে মুক্তি, জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে জনগণের মোহভঙ্গ হয়েছে। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর যেভাবে পূর্ব বাংলার জনগণের মোহভঙ্গ অল্পদিনের মধ্যেই হয়েছিল এবং তারা ধর্মের ব্যাপারে মোহমুক্ত হয়েছিলেন, ঠিক একইভাবে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের জনগণেরও মোহমুক্তি হয়েছিল। তারা খুব স্পষ্টভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেম ইত্যাদি শাসক শ্রেণী ও তাদের দলের কাছে জনগণকে ধাপ্পা দেওয়ার ব্যাপার ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয় যে, ১৯৪৭ সালের পর এবং ১৯৭১ সালের পর এভাবে জনগণের মোহমুক্তির ক্ষেত্রে ধর্মের প্রতি জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি একইরকম ছিল না। বরং একেবারে উল্টো।

পাকিস্তান আন্দোলন হয়েছিল ধর্মের জিকির তুলে। বলা হয়েছিল, মুসলমানদের নিজেদের শাসন কায়েম হলে তারা দুধেভাতে থাকবে, তাদের ওপর কোনো শোষণ-নির্যাতন হবে না। তারা সুখের সাগরে ভাসবে। কিন্তু খুব অল্পদিনের মধ্যে পাকিস্তানের শাসক শ্রেণীর শোষণ-নির্যাতন, ধাপ্পাবাজির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জনগণের মধ্যে হয়েছিল। তারা বুঝেছিলেন, ধর্মের নামে তাদের ধোঁকা দেওয়া হয়েছিল। কাজেই ১৯৪৮ সাল থেকে পূর্ব বাংলায় ধর্মবিযুক্ত (secular) রাজনীতির শর্ত সমাজভূমিতে তৈরি হয়েছিল। সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মীয় চিন্তার পরিবর্তে রাজনীতির অসাম্প্রদায়িকীকরণ শুরু হয়েছিল। ভাষা আন্দোলন থেকে নিয়ে অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেই রাজনীতি বিকশিত হয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে তার একটা পরিণতি ঘটেছিল। সবাই আশা করেছিলেন, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাঙালিদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এখানে জনগণ দুধেভাতে থাকবে, তাদের কাজের কোনো অভাব হবে না, শোষণ-নির্যাতন বন্ধ হবে, জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। বাস্তবত এসবের কিছুই হয়নি। উপরন্তু ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তানি শাসনে তৎকালীন পূর্ব বাংলার জনগণের জীবনে শোষণ-নির্যাতন ও জীবিকার অনিশ্চয়তার যে দুর্যোগ নেমে এসেছিল, তার থেকে বহুগুণ বেশি দুর্যোগ জনগণের জীবনে নেমে এসেছিল ১৯৭১ সালের পর স্বাধীন বাংলাদেশে। জনগণের মোহভঙ্গ শুরু হয়েছিল দ্রুত। কিন্তু এই মোহভঙ্গ হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে এবং পরিস্থিতি আরও ঘোরতর আকার ধারণ করায় জনগণ ধর্মবিমুক্ত রাজনীতির মধ্যে কোনো আশার আলো না দেখতে পেয়ে ধর্মের প্রতি নতুন করে আকৃষ্ট হলেন। এই জীবনে ও এই জগতে বাঙালি শাসক শ্রেণীর থেকে কোনো কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা না দেখে তারা মুসলমান হিসেবে পরকালের জীবনে কিছু প্রাপ্তির আশায় ধর্মকর্মে নিযুক্ত হলেন। এখন দেশে নামাজ, রোজা, কোরবানি, মেয়েদের মাথায় হেজাব পরা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুশীলন বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে ধর্মীয় চিন্তাভাবনা এবং ধর্মচর্চার এই ব্যাপক বিস্তার যে বাংলাদেশের শোষক-শাসক-নির্যাতক শ্রেণীর জনবিরোধী কার্যকলাপের ফলেই ঘটেছে, এ সত্য অস্বীকার করা কোনো সৎ লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়। সমাজভূমিতে এই পরিবর্তনের সুযোগ নিয়েই জামায়াতে ইসলামী এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠন শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের স্বার্থে কোনো কর্মসূচি না দিয়ে, তথাকথিত ধর্মবিযুক্ত রাজনীতির পরিবর্তে জনগণকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে তাদের বাস্তব জীবনের হাজার সমস্যার কোনো সমাধানের পরিবর্তে, ইহলোকের সমস্যা সমাধানের ধারেকাছে না গিয়ে, জনগণের জীবনের চরম হতাশাকে ব্যবহার করে পরকালের কর্মসূচি নিয়ে হাজির হয়েছে। তাদের নানা প্রচারণা জনগণকে বাস্তব জীবনের সমস্যা মোকাবেলা করা ও তার জন্য সংগ্রাম করা থেকে বিরত রেখে নামাজ, রোজা এবং ধর্মচর্চার মাধ্যমে তাদের পরকালে বেহেশতের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। এই পরিবর্তন যদি জনগণের চিন্তায় না ঘটত তাহলে বর্তমানে ধর্মীয় রাজনীতির যে রমরমা অবস্থা দেখা যাচ্ছে তা কিছুতেই সম্ভব হতো না। এর থেকেই বোঝা যায়, বাংলাদেশে ধর্মীয় রাজনীতির যে বিকাশ ঘটেছে, ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের সক্রিয় হওয়া ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সমাজভূমিতে যে শর্ত তৈরি হয়েছে, তার জন্য পাকিস্তানি বা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো জঙ্গি সংগঠন দায়ী নয়। এই শর্ত সৃষ্টি বাংলাদেশের বাঙালি শাসক শ্রেণী এবং তাদের প্রধান দল আওয়ামী লীগেরই কাজ। এ কাজে তাদের বড় সহায়ক হলো তাদের ঘরানার বুদ্ধিজীবীর দল।

জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করার জন্য এখন বাংলাদেশের তথাকথিত 'অসাম্প্রদায়িক' ও 'দেশপ্রেমিক' লোকরা জোর দাবি তুলেছেন। আওয়ামী লীগ ও তাদের বুদ্ধিজীবীদের মুখে এ দাবি এখন এমনভাবে উঠছে যে মনে হয়, বাংলাদেশের জনগণের জীবনে এটাই মূল সমস্যা। জামায়াতে ইসলামী নিষিদ্ধ করলেই জনগণের অবস্থা দুধেভাতে হয়ে তাদের জীবনে স্বর্গ রচিত হবে! এর মধ্য দিয়েই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে! কিন্তু এ কথা বলতেই হচ্ছে যে, জামায়াতে

ইসলামীকে নিষিদ্ধ করার জন্য আওয়ামী লীগওয়ালাদের যে মাতামাতি, তাদের তথাকথিত তদন্ত কমিশন ইত্যাদির যে দাবি ও সুপারিশ হচ্ছে, সেটা কার্যকর হলে তার থেকে বিপজ্জনক ও ভয়াবহ ব্যাপার রাজনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে কমই ঘটতে পারে। এ বিষয়টি স্বীকার না করে উপায় নেই যে, এই মুহূর্তে এদেশে জামায়াতে ইসলামী একটি হিসাবযোগ্য রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এই হিসাব না করে যদি রাজনৈতিকভাবে তার মোকাবেলা না করে তাকে নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা হয়, তাহলে তারা প্রকাশ্য তৎপরতা একেবারে বন্ধ না করলেও তাদের গোপন তৎপরতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। জঙ্গিত্ব বন্ধ করার উদ্দেশ্যে যদি সত্যিই এ কাজ করা হয়, তাহলে সে উদ্দেশ্য মাঠে মারা যাবে। কারণ এর ফলে তারা দুর্বল হওয়ার পরিবর্তে অনেক বেশি চাঙ্গা হবে, 'ইসলামী জোশ' তাদের মধ্যে বড় আকারে বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশের জঙ্গিবাদ বিরাট এক বিপজ্জনক রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি করবে। আইন ও পুলিশ দিয়ে সে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষমতা আওয়ামী লীগের নেই।

বিগত নির্বাচন সামনে রেখে জামায়াতে ইসলামী যেভাবে সরকারের ওপর সরাসরি হামলার পরিবর্তে জনগণের ওপর হামলা করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করেছিল, তাকে জঙ্গিবাদ বলে আখ্যায়িত করা যায় না। কেউ যদি তাকে আল-কায়দার ধর্মীয় জঙ্গিবাদের সঙ্গে তুলনা করেন, তাহলে সেটা হবে এক ভ্রান্ত চিন্তা। জামায়াতের সেই সহিংসতা ছিল একশোভাগ রাজনৈতিক এবং নির্বাচন সামনে রেখেই তা করা হয়েছিল। এ ধরনের জঙ্গি তৎপরতায় আওয়ামী লীগও জামায়াতের থেকে পিছিয়ে নেই। তারা সারাদেশে ছাত্রলীগ, যুবলীগ, খোদ আওয়ামী লীগের কর্মী ও গুন্ডাবাহিনীর মাধ্যমে জনগণের ওপর যেভাবে ব্যাপক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, তার চরিত্র জামায়াতে ইসলামী ও তার ইসলামী ছাত্রশিবির ইত্যাদির ক্রিমিনাল তৎপরতা থেকে ভিন্ন নয়। কাজেই জামায়াতে ইসলামীকে একটি ধর্মীয় জঙ্গিবাদী সংগঠন হিসেবে আইন করে নিষিদ্ধ করার মধ্যে জঙ্গিবাদ মোকাবেলা বা নির্মূল করার কোনো সম্ভাবনাই নেই। উপরন্তু এটা হলো বাংলাদেশে কৃত্রিমভাবে ধর্মীয় জঙ্গিবাদ সৃষ্টিরই এক চক্রান্ত। লাখ লাখ সরল মানুষ, বিশেষত অল্পবয়স্করা আওয়ামী লীগের এই ফাঁদে পড়ে এখন যে দাবি তুলছেন, তার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। এই কাজের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীর নিজস্ব তৎপরতা থেকে আওয়ামী লীগ সরকার, আওয়ামী লীগ দল, তাদের বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠন এবং তাদের ঘরানার বুদ্ধিজীবীর দল বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ আমদানির ক্ষেত্রে অনেক বড় ও বেশি অবদান রাখবে।

যে আওয়ামী লীগ এখন 'জঙ্গিবাদ দমনে'র উদ্দেশ্যে এ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সব রকম কলকাঠি নাড়ছে, তারা শুধু এখনই নয়, বাংলাদেশ আমলের প্রথম থেকেই এমনভাবে কাজ করে আসছে, যার ফলে নতুনভাবে ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতা দানা বাঁধার শর্ত তৈরি হয়েছে। তারা ১৯৫ জন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানি সামরিক অফিসারের কোনো বিচার না করে তাদের অক্ষতভাবে পাকিস্তানে ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে চক্রান্ত করেছিল। 'ক্ষমার আদর্শে' উদ্বুদ্ধ হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান তাদেরকে এবং জামায়াতে সহ তাদের বাংলাদেশী সহযোগীদের শাস্তি না দিয়ে মুক্তি প্রদান করেছিলেন। ভুট্টোর মতো এক নম্বর পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীকে বন্ধু হিসেবে আলিঙ্গন করে বাংলার মাটিতে বিশালভাবে সংবর্ধনা প্রদান করেছিলেন! জামায়াতের নেতাদের জেল থেকে মুক্ত করে তাদের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন দেশ গড়ার কাজে যোগদানের! তার পরবর্তী পদক্ষেপই ছিল জামায়াতের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে তাদের প্রকাশ্য রাজনীতির সুযোগ করে দেওয়া। মুজিবের সুযোগ্য উত্তরসূরী জিয়াউর রহমান সেই কাজই করেছিলেন। এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং তাদের ১৫ দল ও ৭ দল-ভুক্ত বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো জামায়াতেকে তাদের আন্দোলনের শরিক করে নিয়ে তাকে একটি 'গণতান্ত্রিক' দল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল! ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা জামায়াতের আমির নিজামীর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে সরকার গঠন করেছিলেন। নিজামীর সঙ্গে হাসিনার একান্ত বৈঠকের ছবিও প্রকাশিত হয়েছিল সংবাদপত্রে! ১৯৯৬-২০০১ সালে ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত করেনি। এরশাদের সময় ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়েছিল। তার কোনো পরিবর্তন এখনও আওয়ামী লীগ করেনি। এখন তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশাত্মবোধ ইত্যাদির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের পূর্ববর্তী মিত্র জামায়াতেকে নিষিদ্ধ করে নিজেদের জয়জয়কারের ব্যবস্থা করছে! কিন্তু এই জয়জয়কার তাদের হবে না। নিজেদের প্রকাশ্য অনেক প্রচারণা চালিয়ে, সরকারি ক্ষমতায় থেকে অনেক রকম জৌলুস দেখিয়ে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি দেশের সব রকম জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা থেকে সরিয়ে অন্যদিকে নেওয়ার যে চেষ্টা তারা করছে, জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে তারা সেই একই উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাইছে। এর ফলে জামায়াতে ইসলামীকে তাদের বর্তমান অবস্থান থেকে আরও প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থানে ঠেলে দিয়ে অভ্যন্তরীণভাবে বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গিবাদ বিস্তারের ব্যবস্থাই আওয়ামী লীগ করছে। এর ফলে দেশের প্রগতিশীল রাজনীতির বিষম ক্ষতি হবে, বিপদ বাড়বে। এর পরিণতিতে জনগণের জীবনে নিরাপত্তার অভাব আরও বৃদ্ধি পাবে। দেশের রাজনীতিতে জঙ্গিবাদ এমন এক সমস্যা সৃষ্টি করবে, যা বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত দেখা যায় না। এর জন্য আওয়ামী লীগই দায়ী থাকবে এবং এর ফলে তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি দ্রুত সরে গিয়ে তারা নিজেরা এক ভয়াবহ পরিণতির দিকেই এগিয়ে যাবে। ২৬.৩.২০১৪

প্রবন্ধ

অপ্রাতিষ্ঠানিক আত্মনির্ভর ‘হকার অর্থব্যবস্থাকে’ প্রাতিষ্ঠানিক ‘নীল অর্থব্যবস্থায়’ রূপান্তরের সরকারি উদ্যোগ

হকার সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৪

দীপঙ্কর দে

বিশ্বায়নের এই নবপর্যায়ে গত প্রায় দু দশক যাবত পৃথিবীর বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক নানা অর্থকরী কার্যকলাপ-কে, তা অসংগঠিত শিল্প বা পরিষেবা যাই হোক, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের এক পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে— সরকারি স্তরে। স্বভাবতই ভারত সরকার এতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সম্প্রতি সরকার প্রণীত The Street Vendors (Protection of Livelihood & Regulation of Street Vending) Act 2014 উক্ত প্রয়াসের এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

এ আলোচনা মূলত চারটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে—

ক) অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা ও হকার অর্থ্যব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য;

খ) হকার সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রেক্ষাপট ও তার বিভিন্ন ধারা উপধারার, বিশেষ করে নেতিবাচক অংশের আলোচনা;

গ) আত্মনির্ভর ‘হকার অর্থব্যবস্থাকে’ পরনির্ভর ‘নীল অর্থব্যবস্থায়’ রূপান্তরের নানা সরকারি উদ্যোগের অর্থনৈতিক তাৎপর্য;

ঘ) বৃহৎ পুঁজির কবল থেকে কুটীর ও লোকশিল্পকে রক্ষা করার সম্ভাব্য উপায়;

ক) অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা ও ‘হকার অর্থব্যবস্থার’ বৈশিষ্ট্য

বলা হয় হকারি একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক (Informal) অর্থব্যবস্থা। এর মানে কী? অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র (Informal sector) আর অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থব্যবস্থা কি সমার্থক? হকারিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র বলা হবে না কেন? ব্যাপারটা বুঝতে আমাদের একটু শিবের গীত গাইতে হবে।

২০০২ সালের জুন মাসে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (ILO) তাদের ৯০তম সভায় (90th International Labour Conference) ‘শোভন কাজ ও অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থব্যবস্থা’ (Decent work and informal economy) নামে একটি প্রস্তাব অনুমোদন করে। প্রস্তাবে বলা হয় যে কোনো ‘শোভন কাজের চারটে প্রাথমিক শর্তই— যেমন অধিকার (rights), কর্মসংস্থান (employment), সামাজিক সুরক্ষা (social protection) এবং সংগঠন ও সামাজিক মত বিনিময় (organisation and social dialog)— একে অন্যের পরিপূরক। তাই উক্ত সভা মনে করে যে অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থব্যবস্থার নানাবিধ গভীর সমস্যার সমাধানে ও ‘শোভন’ কাজের অধিকার সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজন একটি সুসংহত ও সমন্বিত পদ্ধতি (comprehensive and integrated approach)। তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তারা প্রথামুক্ত ব্যবস্থার সংজ্ঞা পরিবর্তন করে সমস্ত ‘অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র’কে ‘অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থব্যবস্থার’ (Informal economy) অন্তর্গত করে। এভাবেই স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা একটি অর্থব্যবস্থাকে ‘সংজ্ঞা’র কাঠামোয় বেঁধে ফেলে শুরু হয় প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রক্রিয়া।

অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞাটা কেমন? সংক্ষেপে বলা যায় সেই সমস্ত অর্থকরী কার্যকলাপ যা প্রথাগত ভাবে চুক্তিবদ্ধ নয়। ("All economic activities by workers and economic units that are in law or in practice not covered or inefficiently covered by formal arragements. Their activities are not included in the law, or they are not covered in practice which means that although they are operating within the formal reach of the law, the law is not applied or not enforced, or the law discourages compliances because it is inappropriate, burdensome or imposes excessive costs.")

আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন জানালো যে অপ্রাতিষ্ঠানিক কার্যকলাপ অপরাধমূলক (criminal) বা বেআইনি (যেমন চোরাচালান বা নিষিদ্ধ দ্রব্য পাচার) কার্যকলাপ নয়। স্রেফ প্রথাগত ভাবে চুক্তিবদ্ধ নয়, এই যা। বিশদ আলোচনায় আরও বলা হলো যে অপ্রাতিষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অর্থব্যবস্থা সমান্তরাল দুইটি অর্থব্যবস্থা নয়, বরং একে অন্যের পরিপূরক। তাই এই দুই অর্থব্যবস্থার যোগসূত্রগুলো চিহ্নিত করে এদের পারস্পরিক নির্ভরতা আরও সুদৃঢ় করা আশু প্রয়োজন।[১]

এবার আমরা বুঝতে চাইব অপ্রাতিষ্ঠানিকীকরণের এই উদ্যোগ কেন? প্রধান কারণ, পণ্য ও শ্রম বাজার করতে চায় রাষ্ট্র ও বৃহৎপুঁজি। অনুমান করা হয় ২০০৫ সালে শুধু কলকাতা শহরের হকারদেরই বাৎসরিক লেনদেন এর পরিমাণ ছিল ৮০০০ কোটি টাকারও বেশি। এ বাজার আত্মসাৎ করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে বহুজাতিক পুঁজি এই বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্যোগী হয়েছে এবার। সরকার তার সহযোগী মাত্র। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের সহায়তায় বৃহৎ পুঁজি শ্রমবাজারের

পরিধি ও নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে চাইছে স্বাভাবিকভাবেই। হালে লক্ষ্য করা গেছে কিছু অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের শ্রমিকরা, যারা এমনকি কোন স্বীকৃত শ্রমিক সংগঠনেরও আওতাধীন নন, তারাও অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগকারীর থেকে অধিক মজুরি ও অন্যান্য সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হচ্ছেন। অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের সংঘবদ্ধ শ্রমিক সংগঠনগুলো শ্রমিকদের সুযোগসুবিধে ও মজুরি বাড়াতে তেমন সফল হচ্ছে না। পরিসংখ্যান বলছে, বিগত কয়েক বছরে সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমবিরোধ কমেছে লক্ষণীয়ভাবে।[২]

তাই অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে বশে আনতে রাষ্ট্র ও পুঁজি দুপক্ষই উৎসাহী এখন।

হকার অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

শুরুতেই আমাদের বুঝে নেওয়া প্রয়োজন হকার বলতে আমরা কাদের বুঝি এবং এই হকার অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই বা কী?

হকার বা ফেরিওয়ালা তাদেরই বলা হয় যারা রাস্তাঘাটে, বাসে, ট্রামে, ফুটপাথে বা কোনো অস্থায়ী চালাঘরে তাদের পণ্য সামগ্রী বা পরিষেবা সাধারণের কাছে বিক্রি করেন। মোটামুটি তিন ধরনের ফেরিওয়ালার দেখা মেলে— (১) স্থির ফেরিওয়ালা — যারা একটি নির্দিষ্ট স্থানে কোনো অস্থায়ী চালা বানিয়ে নিয়মিত পণ্য বা পরিষেবা বিক্রি করেন। এদের অনেকেই স্থানীয় পুরসভার লাইসেন্সপ্রাপ্ত বা কোন সংগঠন অথবা প্রভাবশালী কর্তৃপক্ষের ছত্রছায়ায় আশ্রিত; (২) ভ্রাম্যমান ফেরিওয়ালা : যারা পায়ে হেঁটে দাঁড়িয়ে, বাঁকা মাথায় বা রেলগাড়িতে ফেরি করেন; (ত) চলমান হকার : এরা বিভিন্ন স্থানে, কখনও সাইকেলে, বাসে বা রেলগাড়ির কামরায়, ফেরি করেন সারাদিন।

কত লোক এই পেশায় যুক্ত? অনুমান করা হয় ভারতের বড় বড় শহরের মোট জনসংখ্যার দুই শতাংশ মানুষ এই পেশায় যুক্ত। বৃহত্তর কলকাতার জনসংখ্যা ১.৪১ কোটি (২০১১ আদমসুমারী অনুযায়ী) ধরলে এই শহরে ফেরিওয়ালার সংখ্যা প্রায় ২.৮ লক্ষ। ফেরিওয়ালার সংখ্যা অনুমান করা কঠিন। কারণ ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশের অর্থব্যবস্থায় এখনও এক বিশাল সংখ্যক মানুষ তথাকথিত অসংগঠিত ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থায় কর্মরত। পারিবারিক ছোট উদ্যোগ বা গোষ্ঠীশ্রমে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, যেমন জামাকাপড়, বাসনকোসন, খাদ্যদ্রব্য, প্রসাধনী, গৃহস্থালির টুকিটাকি ইত্যাদির উৎপাদন ও বিপণনের এক বিশাল কর্মকাণ্ড এ দেশে গড়ে উঠেছে বহু বছর ধরে। ফেরিওয়ালা ও ছোট দোকানদার এই অর্থব্যবস্থার চালিকাশক্তি। জয়নগরের মোয়া, সাদপুরের মাদুর, ফুলিয়ার শাড়ী বা কাশ্মীরের শাল ফেরিওয়ালার কাঁধে চেপেই পৌঁছে যায় গ্রামের হাটে, শহরতলির বাজারে, বড় শহরের ফুটপাতে আর গৃহস্থের ঘরদোরে। সাধারণ মানুষের উদ্যোগে ও সার্বিক অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই নিত্য প্রয়োজনীয় (need based) আত্মনির্ভর অর্থ-ব্যবস্থাকেই বলা যায় হকার অর্থ-ব্যবস্থা। (চিত্র ১)

চিত্র ১ : হকার অর্থব্যবস্থা

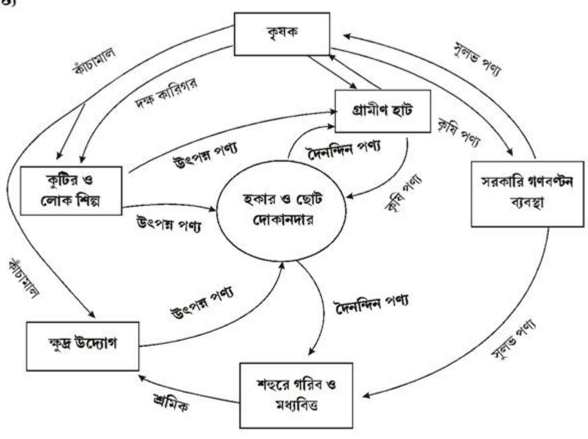

নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় হকার ও ছোট দোকানদার

এ দেশের হকার অর্থব্যবস্থা আন্তর্জাতিক শ্রমসংগঠন বর্ণিত, অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থব্যবস্থার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে অনেক বিক্রেতা (ফেরিওয়ালা, ছোট দোকানদার) অনেক উৎপাদক (ক্ষুদ্র ও অতি-ক্ষুদ্র উৎপাদক, হস্তশিল্পী), হাজারো ক্রেতা। সিংহভাগ বিক্রেতার নিজস্ব কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই, নেই কোন বিধিসম্মত ছাড়পত্র বা লাইসেন্স। উৎপাদক নিজেই কখনও বা বিক্রেতা। তারও অনেক ক্ষেত্রেই কোন আইনি ছাড়পত্র বা উৎকর্ষতার শীলমোহর নেই। ক্রয়বিক্রয় সম্পূর্ণ পারস্পরিক বিশ্বাস নির্ভর। কোন সরকারি নিয়ন্ত্রণ বা ক্রেতা সুরক্ষা বিধি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এ অর্থব্যবস্থা বহুজাতিক বৃহৎপুঁজি বা ব্যাংকিং পুঁজির আওতার বাইরে ক্ষুদ্র পুঁজি নির্ভর এক স্বনিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থা। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে ঘুর পথে এ ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রিত হয় বেআইনি নিয়মে। পুলিশ, সরকারি আধিকারিক, স্থানীয় মস্তান ও রাজনৈতিক নেতাদের এক দালাল চক্র নানা অছিলায় সিধে আদায় করে। খবরে প্রকাশ, কলকাতায় ফেরিওয়ালারা তাদের

লেনদেনের প্রায় তিন শতাংশ নিয়মিত ঘুষ বাবদ দিতে বাধ্য হন এই চক্রকে। (*The Telegraph*, November 30, 2006)

২০০৪ সাল নাগাদ 'হকার সংগ্রাম কমিটি' শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মরত ২৩০৬ জন স্থির হকারের একটি সমীক্ষা করে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নজরে পড়বে[৩]—

(১) সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৭৪.৭১% ফেরিওয়ালা জানিয়েছেন যে তাঁদের পরিবারের ভরণপোষণ সম্পূর্ণভাবেই এই পেশার উপর নির্ভরশীল;

(২) সে সময় (২০০৪) মাত্র ২৮.৭৮% ফেরিওয়ালা কোন স্বীকৃত শ্রমিক সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন;

(৩) ৬৬.৯১% ফেরিওয়ালা বাড়ী থেকে পায়ে হেঁটে কর্মস্থলে যাতায়াত করেন;

(৪) ৮২.৫২% ফেরিওয়ালা সে সময় অন্তত ২ জন সহযোগী নিয়োগ করেছিলেন;

(৫) ৭০% ফেরিওয়ালা পারিবারিক পুঁজিতে ও মাত্র ০.৪৩% ফেরিওয়ালা ব্যাংক ঋণ জোগাড় করে এই পেশা শুরু করেন। ৭৪.৮৪% ক্ষেত্রে কার্যকরী মূলধন (working capital) তারা নিজেরাই জোগাড় করেন;

(৬) ৯০.১৬% বিক্রিত পণ্যই ছিল স্থানীয় উৎপাদিত

এমন একটি আত্মনির্ভর অর্থব্যবস্থাকে ভাঙতে না পারলে বৃহৎ পুঁজির বিকাশ থমকে থাকে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুলিশ দিয়ে ভাঙলে রাজনৈতিক সমস্যা বাড়ে। তাই পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ। না ভেঙে কবজা করা— সহযোগী করে তোলা— বৃহৎ পুঁজির নির্ধরিত নিয়মে।

(খ) হকার সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রেক্ষাপট ও তার বিভিন্ন ধারা উপধারা

বড় শহরের পৌর কর্তৃপক্ষের সাথে ফেরিওয়ালাদের সম্পর্ক কখনই মধুর ছিল না— না বৃটিশ ভারতে বা স্বাধীন ভারতে। শহরের রাস্তায়, ফুটপাতে, হকারের উপস্থিতি প্রশাসন না পেরেছে মেনে নিতে, না পেরেছে অস্বীকার করতে। রাষ্ট্র জানে যে এক বিশাল সংখ্যক নাগরিক এই অর্থকরী কর্মকাণ্ডে জড়িত ফেরি বিক্রেতা হিসেবে নয়, ক্রেতা ও ক্ষুদ্র উৎপাদক হিসেবেও। তা সত্ত্বেও সরকার সম্ভবত চারটি কারণে হকারকে স্বীকৃতি দিতে চায় নি—

(১) সংগঠিত মধ্য ও বৃহৎ বিক্রেতাদের বাধায়;

(২) লক্ষ লক্ষ স্থির, ভ্রাম্যমান ও চলমান ফেরিওয়ালাদের প্রশাসনিক ভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখার অক্ষমতায়;

(৩) শহরের পাবলিক প্লেস— যেমন ফুটপাত ও পার্ক সুন্দর রাখার তাগিদে;

(৪) পাবলিক প্লেসে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখতে।

তাই স্বভাবতই হকার ও রাষ্ট্রের সংঘাত বেধেছে, হকাররা বারবার উচ্ছেদ হয়েছেন তাদের কর্মস্থল থেকে। কখনও রাতের অন্ধকারে, কখনও প্রকাশ্য দিবালোকে বুলডোজার গুড়িয়ে দিয়েছে তাদের অস্থায়ী ঠিকানা। এক রাস্তার মোড় ছেড়ে তারা বসেছেন অন্য রাস্তার মোড়ে, এ বাজার ছেড়ে অন্য বাজারে। এভাবেই চলেছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।

দু দশক আগে বিশ্বপুঁজির আরাধনায় রাষ্ট্র সৌন্দর্যায়নে মন দেয়। বৃহৎ পুঁজি নয়নের মণি তার। বিশ্বায়ন ও উদারিকরণের এ যুগে বিশ্বপুঁজির দেশের দেশীয় বৃহৎ পুঁজি। বাজারের পরিধি বাড়াতে চায় তারা— ছোট মাঝারি কোন ক্রেতাকেই আর ছাড়লে চলবে না। সংগঠিত এই বৃহৎ পুঁজির চাহিদা মেটাতে রাষ্ট্র আরও কঠোর হয়েছে। বাম শাসিত এই রাজ্যও পিছিয়ে ছিল না। কলকাতা করপোরেশন Kolkata Municipal Corporation (Second Amendment) Bill 1997-এ (যা পরে আইনে পরিণত হয়) হকারিতে নানা বিধিনিষেধের সুপারিশ করে। সে আইনের ৩৭১ ধারা মোতাবেক, ক্ষেত্র বিশেষে, রাজপথে হকারি বেআইনি ও জামিন-অযোগ্য অপরাধ বলে ধার্য করা হয়।

কঠিন আইন প্রণয়নের সাথে সাথে রাষ্ট্র সন্ত্রাসের পথও বেছে নেয় যাতে হকাররা রণে ভঙ্গ দেয়। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৯৬ সালে এক গভীর রাতে কলকাতা-গড়িয়াহাট ও শ্যামবাজারে অতর্কিতে অভিযান চালিয়ে রাষ্ট্র হকারদের অস্থায়ী দোকানপাট ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়। এ অভিযানের পোশাকী নাম ছিল 'অপারেশন সানশাইন'। অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে হটিয়ে বৃহৎ পুঁজির শুভাগমনের সূচনা। ঘটনার প্রায় এক দশক পর তৎকালীন পুলিশ কমিশনার তুষার তালুকদার[৪] একটি দৈনিকে (দৈনিক স্টেটসম্যান ৯.২.০৭) আক্ষেপ করে লিখেছেন, 'অপারেশন সানশাইন' এর নামে হকার উচ্ছেদের পর তৎকালীন সরকার বিকল্প কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, যদিও পুলিশ, অন্যান্যদের সহায়তায় বিকল্প পুনর্বাসন পরিকল্পনা আগেই তৈরি করে রেখেছিল। এতেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করতেই চেয়েছিল সে রাতে।

কিন্তু হকাররা আর যাবে কোথায়? উৎখাত হতে হতে পথে এসে দাঁড়িয়েছে তারা। বিকল্প আর কোন পথ জানা নেই তাদের কাছে। অগত্যা তারা জোট বাঁধে, রুখে দাঁড়ায়। বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের একাংশ তাদের সমর্থনে পথে নামে, আইন সাহায্য করে, সাহস যোগায়। রাষ্ট্র সাময়িকভাবে পিছু হটতে বাধ্য হয়। বৃহৎ পুঁজির সঞ্চালকরা বুঝতে পারে, এই একবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের জোরে সব কার্যসিদ্ধ হবে না। অন্য পথ নিতে হবে। যাকে বশে আনা যাবে না তাকে করায়ত্ত করতে হবে নিয়ন্ত্রণের শৃঙ্খলে বেধে ফেলে। এভাবেই বিশ্বব্যাপী শুরু হয় অপ্রাতিষ্ঠানিক

অর্থব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের নানা উদ্যোগ। তারই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে ২০০২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে গৃহীত হয় 'শোভন কাজ ও অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থব্যবস্থার' প্রস্তাব।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিকী করণের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মূলত তিন ধরনের পন্থা গ্রহণ করা হয়— যা একে অপরের পরিপূরক। (১) অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগে যুক্ত কারিগরদের (যেমন ছুতার, তাঁতি, মুচি, কুমোর ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান; উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ে সাহায্য করা, ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা ইত্যাদি; (২) অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় যুক্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে (যেমন স্বাস্থ্য ও জীবনবিমা) অন্তর্ভুক্ত করা; (৩) অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় নিয়ন্ত্রণের পরিকাঠামো শক্তিশালী করা।[৫]

আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের সুপারিশ মতে ভারত সরকারও অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে করায়ত্ত করার পথে অগ্রসর হয়। সংঘর্ষের পথ ছেড়ে নিয়ন্ত্রণের পথ বেছে নেয় রাষ্ট্র। এই উদ্দেশ্যে ২০০৪ সালে 'ন্যাশনাল পলিসি অন আরবান স্ট্রিট ভেন্ডার' নামে একটি খসড়া প্রস্তাব প্রকাশ করে। দীর্ঘ পাঁচবছর আলাপ আলোচনার পর ২০০৯ সালে সরকার জাতীয় হকার নীতি (National Policy on Urban Street Vendors 2009) প্রণয়ণ করে। উক্ত হকার নীতিতে রাষ্ট্র হকারদের 'অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগ' (micro-enterprise) হিসেবে অভিহিত করে। হকারকে 'অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগপতি' বলে চিহ্নিত করে তাকে 'আন্তর্জাতিক সরবরাহ ও বিপণন প্রক্রিয়ার (global supply chain) সাথে জুড়ে দেওয়ার এই সরকারি প্রচেষ্টাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফেরিওয়ালা এবার নিজেকে শ্রমিক ভাববে না— মনে প্রাণে সে হয়ে উঠবে বিশ্বপুঁজির অংশীদার— যত ক্ষুদ্রই হোক সে অংশ!! ঠিক এভাবেই গত দুদশকে মধ্যবিত্তের এক বিশাল অংশকে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের লোভ দেখিয়ে তাদেরকেও বৃহৎ পুঁজির অতিক্ষুদ্র অংশীদার করা হয়েছে। শেয়ার বাজার চাঙ্গা হলে তারা এখন স্বাভাবিকভাবেই উল্লসিত হন। শ্রমজীবী মধ্যবিত্ত পুঁজি আর শ্রমের বিরোধে কোন পক্ষ বেছে নেবেন বুঝে উঠতে পারেন না এখন। উক্ত হকারনীতিতে ফেরিওয়ালাদের ফটো আইডেনটিটি কার্ড প্রদান, 'অতিক্ষুদ্র উদ্যোগপতি' হিসাবে তাদের কারিগরি ও কারবার সংগঠন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও ব্যাঙ্কিং পরিষেবার আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে নানা পরিকল্পনা প্রণয়ণের উল্লেখ আছে।

জাতীয় হকার নীতি প্রণয়নের চার বছরের মাথায় ২০১৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill 2013 লোকসভায় পাশ হয়। এবং গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ রাজ্যসভাও তাতে সম্মতি দেয় ও রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর মার্চ মাসে তা আইনে পরিণত হয়।

উক্ত আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল—

(১) শহরের হকারের সংখ্যা সেই শহরের মোট জনসংখ্যার ২.৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে;

(২) রেলগাড়ী ও রেল স্টেশনে কর্মরত হকাররা এই আইনের আওতাভুক্ত নন ('চলমান' হকাররা শহরের সুদৃশ্য আধুনিক বিপণির প্রতিযোগী নয় বলে?);

(৩) Town Vending Committee (TVC), যেখানে হকার সংগঠনের প্রতিনিধিরাও থাকবেন, সেই শহরের হকার স্বার্থরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

(৪) শহরের কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় (vending zone) ফেরি করা যাবে। কোথায় ফেরি করা যাবে বা যাবে না তা নির্ধারণ করবে Town Vending Committee (TVC);

(৫) TVC শহরের সব বর্তমান হকারের সমীক্ষা করে তারা যাতে 'ভেন্ডিং জোন'-এ ফেরি করার সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করবে। উক্ত হকারদের লাইসেন্স প্রদান করা হবে;

(৬) প্রতি পাঁচ বছরের মাথায় TVC অনুরূপ সমীক্ষা করবে। যদি কোন নতুন হকার উক্ত দুটি সমীক্ষার অন্তর্বর্তী সময়ে ফেরি করতে চান তবে তাদের TVC-র কাছে আবেদন করতে হবে। TVC অনুমতি দিলেই তিনি শহরে ফেরি করতে পারবেন;

(৭) সব লাইসেন্স প্রাপ্ত হকারকে সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়া হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে TVC হকার লাইসেন্স বাতিল করতে পারবে;

(৮) লাইসেন্স প্রাপ্ত হকার TVC নির্ধারিত সীমা রেখার মধ্যে ফেরি করতে পারবেন। 'নো ভেন্ডিং জোন' বা অন্য কোনো স্থানে ফেরি করা যাবে না;

(৯) পৌর কর্তৃপক্ষ TVCর সম্মতিক্রমে জনস্বার্থে যে কোন 'ভেন্ডিং জোন'কে 'নো ভেন্ডিং জোন' বলে ঘোষণা করতে পারবে;

(১০) পৌর কর্তৃপক্ষ সেই সব হকারদের উচ্ছেদ করতে পারবে যাদের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে বা যাদের ফেরি করার কোন অনুমতিপত্র মেলেনি;

(১১) পৌর কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সধারী কোন হকারকে স্থানান্তরিত করতে চাইলে বা কোন কারণে উচ্ছেদ করতে চাইলে অন্তত তিরিশ দিনের আগাম নোটিশ জারি করতে হবে। নোটিশ জারির সময়সীমার মধ্যে উক্ত হকার জায়গা ছেড়ে না দিলে কর্তৃপক্ষ বল প্রয়োগ করে (physically) তাকে উচ্ছেদ করতে পারবে। প্রয়োজনে হকারের পণ্যসামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা যাবে;

(১২) কোনটি 'স্বাভাবিক বাজার' (natural market)

যেখানে বহুদিন ধরে ক্রেতা বিক্রেতা কেনা বেচা করেন, TVC-র সুপারিশক্রমে তা নির্ধারণ করবে স্থানীয় পৌরকর্তৃপক্ষ;

(১৩) এ ছাড়া পুলিশি হেনস্থা রোধ, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, ঋণ, বিমা ও নানা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণের কথাও উক্ত আইনে বলা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেরি করার অধিকার আইনি স্বীকৃতি পেয়েছে;

(১৪) হকার নিয়ন্ত্রণে TVC-কে বিশাল ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মূলত এই কমিটিই শহরের হকারদের হর্তাকর্তা বিধাতা। দেখা যাক এই অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন TVC কমিটিতে কারা থাকবেন ও কীভাবেই বা তারা মনোনীত হবেন। বলা হয়েছে TVC তে মূলত থাকবেন:

পৌর অধিকর্তা (Municipal Commissioner)— তিনিই হবেন TVC-র সভাপতি।

অন্য সদস্যরা মনোনীত হবেন বিভিন্ন সংস্থা থেকে। যেমন পৌর প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা ও পরিকল্পনা বিভাগ, পুলিশ, হকার সংগঠন, বাজার সমিতি, বণিকসভা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, নাগরিক সংগঠন ও ব্যাংকের প্রতিনিধিরা TVC-র সদস্য হবেন। আইনে আরও বলা হয়েছে যে TVC-তে স্বেচ্ছাসেবী ও নাগরিক সংগঠনের যৌথ প্রতিনিধিত্ব ন্যূনতম ১০ শতাংশ হতে হবে। এবং হকার সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব হবে ন্যূনতম ৪০ শতাংশ। হকার প্রতিনিধিরা সংগঠনের সভ্য দ্বারা নির্বাচিত হবেন এবং উক্ত প্রতিনিধিদের অন্তত এক তৃতীয়াংশ হবেন মহিলা। তাছাড়া তপসিলি জাতি, উপজাতি, পিছিয়ে পড়া শ্রেণী ও সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে TVC-তে হকার প্রতিনিধিদের দলে।

তা হলে কী দাঁড়ালো? যে TVC শহরকে 'হকিং' বা 'নো হকিং' জোনে ভাগ করবে, কোন্ হকার লাইসেন্স পাবে বা না পাবে (পেলেও কোথায় ফিরি করবে) তা ঠিক করবে, স্বাভাবিক ভাবে গজিয়ে ওঠা বাজার (natural market) থাকবে না বন্ধ হবে সে সিদ্ধান্তও নেবে, সেই TVC-তে হকারের প্রতিনিধিত্ব ৪০ শতাংশ। মানে তারা সেখানে সংখ্যালঘু। শুধু তাই নয়, জাতপাত, ধর্মীয় বিভাজনের বীজও সুচতুরভাবে রোপণ হয়েছে এ আইনে। হকার সংগঠনগুলো, যারা এই আইনের স্বপক্ষে সওয়াল করছেন, দাবি করছেন যে TVC-স্বেচ্ছাসেবী ও নাগরিক সংগঠনের ভোট (১০ শতাংশ) তাদের দিকেই থাকবে। কর্পোরেট পুঁজি চালিত বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার খবর আমরা সবাই জানি। তারাই যে TVC-তে স্থান পাবে না তা কোন্ ভরসায় ভাবছে হকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ? এ আইনের ফলে নিরাপত্তার নামে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে একটি স্বাধীন স্বনির্ভর পেশা। এক অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থব্যবস্থাকে আগ্রাসী বিশ্বপুঁজির অতিক্ষুদ্র সহযোগীতে পরিণত করবে হকার সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৪।

রাষ্ট্রের এই প্রচেষ্টা শুধু হকার নিয়ন্ত্রণেই সীমাবদ্ধ নয়। খসড়া 'জাতীয় হকার নীতি ২০০৪' নিয়ে আলোচনা চলার ফাঁকে ভারত সরকার অপ্রাতিষ্ঠানিক কুটির ও লোক শিল্পকেও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে Micro, Small & Medium Enterprises Development (MSMED) Act 2006 প্রণয়ন করে। এভাবেই ভারতের লক্ষ লক্ষ কারিগর ও লোকশিল্পীদেরও 'অতিক্ষুদ্র উদ্যোগপতি'তে পরিণত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। উক্ত আইন মোতাবেক উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্রকে দুভাগে ভাগ করে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে পুঁজি বিনিয়োগের পরিষেবার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ মাত্রা স্থির হয়েছে দশ লক্ষ টাকা। উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ মাত্রা ধার্য হয়েছে পঁচিশ লক্ষ টাকা। এই সংজ্ঞা অনুসারে সব ছোট দোকানদার, হকার, লোকশিল্পীরা (পটুয়া, বাউল, কীর্তনিয়া ইত্যাদি), তাঁতি, মুচি, কুমোর সবাই এখন 'অতিক্ষুদ্র উদ্যোগপতি'। হালে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যের ঐতিহ্যশালী কুটির ও লোকশিল্পকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সরকারি সহায়তায় লোকশিল্পমেলা সংগঠিত করে শিল্পীদের প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যবিমা ও ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তদুপরি হাজার হাজার লোকশিল্পীদের সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদানের মাধ্যমে তাদের পঞ্জীকরণের এক বিশাল কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পঞ্জীকরণই হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির প্রাথমিক ধাপ। উন্নতমানের তথ্য প্রযুক্তির যেমন বায়োমেট্রিক কার্ড, জিপিএস ম্যাপ) সাহায্যে এখন রাষ্ট্র ও বৃহৎপুঁজির পক্ষে লোকশিল্পের মত অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকেও নিয়ন্ত্রণ ও করায়ত্ত করা সম্ভব হচ্ছে সহজেই।

এ দেশের হকার অর্থব্যবস্থায় গ্রামের কুটির, লোকশিল্প ও শহরের ফেরিওয়ালা একে অন্যের পরিপূরক। তাই রাষ্ট্র হকার অর্থব্যবস্থার এই দুই মূল স্তম্ভকেই একই স্থানে নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নিয়েছে। শতাব্দী-প্রাচীন অপ্রাতিষ্ঠানিক ও স্বনির্ভর একটি অর্থব্যবস্থা বিলুপ্ত হচ্ছে বৃহৎ পুঁজির সর্বগ্রাসী আগ্রাসনে।

গ) আত্মনির্ভর 'হকার অর্থব্যবস্থা'কে পরনির্ভর নীল অর্থব্যবস্থায় রূপায়ণের নানা সরকারি উদ্যোগের অর্থনৈতিক তাৎপর্য

বিগত দুই দশক ধরে বিশ্বায়নের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এ দেশে তার প্রধান চালিকা শক্তি 'আন্তর্জাতিক বিপণন শৃঙ্খল (global supply chain)। এই বহুজাতিক বিপণন প্রক্রিয়ার জাল বিশ্বময় ছড়ানো। দিন দিন তার পরিধি বিস্তীর্ণ হচ্ছে অর্থব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে। অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক করে নিচ্ছে যে।

এতদিন দেশীয় অভ্যন্তরীণ বাজার আবর্তিত হয়েছে অসংগঠিত হকারদের ঘিরেই। (চিত্র ১ দ্রষ্টব্য)। বিশ্বায়নের পথে প্রধান অন্তরায় সাধারণ মানুষের এই হকার অর্থব্যবস্থা যা এ দেশের কোটি কোটি মানুষকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের যোগান

দিয়ে এসেছে বহু যুগ ধরেই। একে না ভাঙলে বিশ্বায়নের ঘোড়া থমকে যাবে। তাই সুচতুর ভাবে এই হকার অর্থব্যবস্থাকেই আন্তর্জাতিক সরবরাহ ও বিপণন ব্যবস্থার সাথে জুড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আইনি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। শুধু শহরের হকারই নয়, এই প্রক্রিয়ায় দেশের লক্ষ লক্ষ স্বনিয়ন্ত্রিত কুটির শিল্পও ক্রমশ বহুজাতিক সংস্থার যোগানদারে পরিণত হবে।

ভারতের মত বিশাল ও বৈচিত্র্যময় দেশে চাইলেই এত সহজে অর্থব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা সহজ নয়। দু একটা আইন প্রয়োগ করলেই সব পালটে যায় না। রাষ্ট্র ও বৃহৎ পুঁজির কর্ণধাররা তা বিলক্ষণ জানে। তাই খুব পরিকল্পিত ভাবে এক দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পনা করেই তারা আসরে নেমেছে। ১২০ কোটী লোকের বিশাল বাজার করায়ত্ত করতেই হবে, যত সময়ই লাগুক। আলোচ্য 'হকার সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৪' আসলে এক বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ। নিম্নে আলোচিত পরস্পর সম্পর্কিত অন্যান্য উদ্যোগের নিরিখে এর বিশ্লেষণ না করলে উক্ত আইনের মূল উদ্দেশ্য ও পরিণাম আমাদের অধরাই থেকে যাবে।

সাম্প্রতিক কিছু জনহিতকর সরকারি উদ্যোগের নমুনা :

১) Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission 2005 : আমরা আগেই দেখেছি হকার অর্থব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল গত দশকের মাঝামাঝি সময়ে (Draft National Policy for Urban Street Vendors 2004, Micro, Small & Medium Enterprise Development Act 2006)। প্রায় একই সময়ে ভারত সরকার ৫০,০০০ কোটি টাকার JNNURM নামে সাত বছরের এক কর্মসূচি চালু করে, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেশের ৬৩টি শহরকে আধুনিক করে তোলা। শহরগুলোর খোলনলচে বদলে ফেলা ছিল সেই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। বলা হয়েছিল, ভারতের জাতীয় উৎপাদনের ৬৫ শতাংশ উৎপাদন হবে শহরের শিল্পাঞ্চলে। অর্থব্যবস্থার ভরকেন্দ্র গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিত করাই ছিল উক্ত প্রকল্পের উদ্দেশ্য। সরকার জানত, কৃষিকর্মে স্থিতাবস্থার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হবে। বনভূমির আদিবাসী ও বনবাসীরাও পাহাড় জঙ্গল ছেড়ে শহরের প্রান্তে আস্তানা গড়বে, কারণ খননকার্যে বিদেশী বিনিয়োগের ঢালাও অনুমতি দেওয়ার ফলে তারাও তাদের ভিটে থেকে উচ্ছেদ হবে। চীনের সাথে পাল্লা দিয়ে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শিল্প উৎপাদক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে চাই লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। সস্তা শ্রমের আকর্ষণে শিল্প উৎপাদনে বিনিয়োগ হবে বিদেশি পুঁজি, পুঁজিকে বরণ করতে চাই উপযুক্ত পরিকাঠামো। তাই JNNURM। এই কর্মসূচির সম্ভাব্য পরিণতি কী? প্রত্যক্ষ পরিণাম : সৌন্দর্যায়নের নামে শহর থেকে বস্তি, ক্ষুদ্র শিল্প উচ্ছেদ ও হকার নিয়ন্ত্রণ। পরোক্ষ দীর্ঘমেয়াদি পরিণাম : এই সব ঝকঝকে শহরের উপকণ্ঠে উপনগরী নির্মাণ। লক্ষ লক্ষ হেক্টর কৃষি জমি রূপান্তরিত হবে এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন, কেমিক্যাল হাব বা ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং জোন-এ। সেখানে বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তিকে গড়ে উঠবে নানা আধুনিক শিল্প। পশ্চিমী দূষণকারী শিল্পও স্থানান্তরিত হবে এ সব নূতন শিল্প শহরে। হলদিয়ায় মিৎসুবিসিকে (Mistubishi Chemical Corporation) কেন্দ্র করে এমনই একটি কেমিক্যাল হাব গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিল বিগত বাম সরকার। মিৎসুবিসির এই পিটিএ (Purified Terephalic Acid) কারখানাটি একটি অত্যন্ত দূষণকারী উদ্যোগ। পৃথিবীর বহুদেশে পিটিএ উৎপাদন এখন বন্ধ। ২০০৯ সালে মিৎসুবিসি হলদিয়া কারখানায় তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করেছে। এখন হলদিয়া কারখানাটি তাদের দ্বিতীয় বৃহৎ পিটিএ কারখানা। অন্যটি দক্ষিণ কোরিয়াতে। অত্যধিক দূষণকারী শিল্প বলে নিজ দেশ জাপানেও তারা পিটিএ উৎপাদন করে না।

JNNURM-এর দ্বিতীয় সম্ভাব্য পরোক্ষ পরিণাম : দেশের কৃষি ব্যবস্থার ভয়াবহ সংকট। স্মরণ থাকতে পারে যে গত শতাব্দীর ষাটের দশকের সবুজ বিপ্লবের পর বহু প্রান্তিক চাষী গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হয়েছিল। সদ্য স্বাধীন দেশের শিল্প উদ্যোগে তাদের এক বিরাট অংশ কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল নানা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে যুক্ত থেকে।

গত পাঁচদশক সরকারী জন্মনিয়ন্ত্রণের কল্যাণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও এখন প্রায় স্তব্ধ। তাহলে বহুজাতিক সংস্থার সস্তায় শ্রমিক জুটবে কোত্থেকে? অগত্যা দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের ডাক। এতে এক ঢিলে দুই পাখি মারার গল্প বলা হচ্ছে। শিল্প উৎপাদনে চাই লক্ষ লক্ষ একর চাষের জমি। আর কোটি কোটি ভুখা শ্রমিকের চাই সস্তা খাবার। জমি থেকে উৎখাত হওয়া কৃষক পরিণত হবে অদক্ষ শিল্প শ্রমিকে। বাস্তবেও তাই ঘটেছে। ২০০১-২০১১ এই এক দশকে প্রথমবার ভারতে কৃষকের সংখ্যা উল্লেখ্যযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে'। (সারণী ১ দ্রষ্টব্য)

সারণী ১ : কৃষি কাজে যুক্ত ব্যক্তি (কোটি)

	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
কৃষক	৬.৯৯	৯.৯৬	৭.৮২	৯.২৫	১১.০৭	১২.৭৩	১১.৮৭
কৃষি শ্রমিক	২.৭৩	৩.১৫	৪.৭৫	৫.৫৫	৭.৪৬	১০.৬৮	১৪.৪৩

সূত্র : সেন্সাস রিপোর্ট, ২০১১, টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়া, ১ মে ২০১৩

গত দুদশক ধরে কৃষিতে বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে। ফলে খাদ্য উৎপাদন থমকে যাচ্ছে। ২০১১-১২ সালে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৫৯.২৯ মেট্রিক টন। ২০১২-১৩ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ২৫৬.৩৬ মেট্রিক টন। উপরন্তু খাদ্যপণ্য (ডাল, গম, সবজি, ফল, মাছ) রপ্তানিতে উৎসাহ দিচ্ছে সরকার। ২০১২-১৩ সালে ভারত কৃষিপণ্য রপ্তানি করেছে ৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ বছর তা ৪৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে অনুমান। অগত্যা দেশে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদে এবার শুরু হয়েছে 'জিন পরিবর্তিত বীজ' নির্ভর দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের সওয়াল। দেশের কোটি কোটি ভুখা মানুষের জন্যে নোনা জমিতে আর্সেনিক-মেশা পাতাল জলে চাষ হবে জিএম শস্য। আর বৃষ্টির জলে দেশি বীজ আর জৈব সারে উৎপন্ন হবে জৈব ফসল, দেশ বিদেশের বিত্তবান ক্রেতার জন্য। এভাবেই আমূল বদলে যাবে দেশের কৃষি ব্যবস্থা ও নাগরিকের খাদ্যাভ্যাস।

(২) Indo-US knowledge initiative on Agriculture, Education, Research, Services and Commercial Linkages 2005 : এই উদ্যোগের আশু উদ্দেশ্য—

—'চিরসবুজ বিপ্লব' (evergreen revolution) সংগঠিত করতে স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রদের আধুনিক কৃষি বিজ্ঞান ও কারিগরিতে শিক্ষিত করা;

—খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনে সহযোগিতা;

—বায়োটেকনলজির প্রসার;

—জল সংরক্ষণে সহযোগিতা প্রদান।

কর্মসূচি রূপায়ণে যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গড়া হয়েছিল তার সদস্যদের তালিকা দেখলেই এই উদ্যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য মালুম হবে। তালিকায় উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীরা ছিলেন ড. নর্মান বোরলগ ও ড. এম এস স্বামীনাথন। দুজনেই প্রথম সবুজ বিপ্লবের কান্ডারী। সে তালিকায় বেসরকারি শিল্পসংস্থার সদস্যরা হলেন ওয়ালমার্ট (পৃথিবীর বহুজাতিক খুচরো ব্যবসায়ী), মনস্যান্টো (পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বীজ ব্যবসায়ী যারা কৃষিতে জিএম বীজ প্রচলনে তৎপর), আর্চার ড্যানিয়েল মিডল্যান্ড কোম্পানি (বহুজাতিক সংস্থা, যারা মূলত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনে সিদ্ধহস্ত) ও আইটিসি (এই ভারতীয় বহুজাতিক e-chopal নামে দেশব্যাপী এক সরবরাহ ও বিপণন শৃঙ্খল গঠন করেছে) প্রতিনিধিরা।

এই ইন্দো-মার্কিন উদ্যোগের সম্ভাব্য পরিণাম ভারতের খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনে বহুজাতিক সংস্থার সার্বিক নিয়ন্ত্রণ।

(৩) The National Rural Employment Guarantee Act 2005 (পরবর্তীতে MGNREGA):

প্রতি গ্রামীণ পরিবারের অন্তত একজন প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের, যে অদক্ষ কায়িক শ্রম প্রদানে উৎসাহী, বছরে অন্তত একশো দিনের কর্মসংস্থানের উদ্যোগে।

অত্যন্ত সাধু উদ্যোগ সন্দেহ নেই। উদ্বৃত্ত অদক্ষ কৃষি শ্রমিককে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি রাস্তাঘাট, খালবিল, পুকুর সংস্কার ও বনসৃজনের মাধ্যমে সামাজিক সম্পদ সৃষ্টির এটি একটি বহুচর্চিত উদ্যোগ। এর আগেও 'কাজের বদলে খাদ্য' কর্মসূচির মাধ্যমে এধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এ দেশে। প্রশ্ন হচ্ছে, আমজনতার শ্রমে সৃষ্ট এই সামাজিক সম্পদের মালিকানা সে অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর হাতে আসবে তো? পরবর্তীতে বৃহৎ পুঁজি আত্মসাৎ করবে বলেই 'সামাজিক সম্পদ' সৃষ্টির এই নয়া উদ্যোগ নয় তো? এ উদ্বেগ অযৌক্তিক মনে হয় না যখন দেখি বণিকসভা ও ম্যানেজমেন্ট কলেজ আয়োজিত সভায় এ রাজ্যের শিল্প উন্নয়ন নিগমের ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক অভিরূপ সরকারও 'কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির পণ্যে বেসরকারি ও বৃহৎ পুঁজির প্রয়োজন রয়েছে' বলে সওয়াল করেন।[৬] এই আশঙ্কা আরও জোরদার হয় যখন 'জল ধর জল ভর' কর্মসূচির সাথে তাল মিলিয়ে গভীর নলকূপ খননের সরকারি উদ্যোগও জোর কদমে এগোয়। তবে কোন চাষে লাগবে বৃষ্টির মিষ্টি জল? ধরুন সরকার কয়েক হাজার বিঘে কৃষি জমি দখল করে একটি কৃষি রপ্তানি ক্ষেত্র নির্মাণ করলো। চুক্তি চাষের মাধ্যমে সেখানে শুরু হলো রপ্তানি উপযোগী ফল, সবজী ও নানা সুস্বাদু প্রজাতির ধান চাষ। খালবিলে ধরে রাখা বৃষ্টির মিষ্টি জলে (আর্সেনিক-মেশা পাতাল জলে চাষ করলে খাদ্য মান রক্ষা হবে না, বাতিল হবে রপ্তানির বরাত) জৈব পদ্ধতিতে উৎপন্ন ফসল বহুজাতিকের হাত ধরে পাড়ি দিল ভিন দেশে। ভুল বললাম— শুধু ফসলই পাড়ি দিল না— চাল, লিচু, ব্রোকোলীর পিঠে চেপে পাড়ি দিল লক্ষ লক্ষ গ্যালন অদৃশ্য মিঠে জল— virtual water। সৃষ্ট হওয়া সামাজিক সম্পদের সুফল পেল বহুজাতিক সংস্থা, ঠিক যেভাবে বাংলার ভেষজ নীল রপ্তানি করে লাভবান হয়েছে তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, আর ভাতে মরেছে বাংলার কৃষক।

বিগত কয়েক দশকে কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে দ্রুত হারে (সারণী ১ দ্রষ্টব্য) কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ থমকে গেছে। ২০১২ সালের একটি সরকারি দলিল স্বীকার করছে "....jobless growth in recent years has been accompanied by growth in casualization and informalization"।[৭] MGNREGA-র মাধ্যমে এই ক্রমবর্ধমান অপ্রাতিষ্ঠানিক কৃষি শ্রমিকদের পঞ্জীকরণের ব্যবস্থা করা গেল। দ্বিতীয়ত, 'কাজের বদলে খাদ্য না দিয়ে ন্যূনতম নগদ মজুরি দেওয়ায় কৃষিকাজে মজুরি বেড়ে গেল। ফসলের মরশুমে মজুরের জোগানও কমে যাওয়ায় ছোট ও মাঝারি চাষির পক্ষে চাষবাস দিন দিন অলাভজনক হয়ে পড়ল। ফলে তারা কৃষিকাজ ছেড়ে অন্য পেশায় যুক্ত হলেন। অনেকে আত্মহত্যা করলেন।[৮]

২০০১-২০১১ সালের ব্যবধানে প্রায় ৮৬ লক্ষ কৃষক কৃষিকাজ থেকে সরে এসেছেন (সারণী ১ দ্রষ্টব্য)। রাষ্ট্র ও বৃহৎপুঁজির কারবারিরা এটাই চাইছিল। উৎপাদন শিল্পে শ্রমিক জোগানোর এটাই তো সহজ পথ। নগদ মজুরি না দিয়ে যদি কাজের বদলে সমমূল্যের খাদ্য দেওয়া হতো, তাহলে গ্রামীণ পরিবারের অপুষ্টি খানিকটা কমত আর কৃষিরও বিকাশ হতো। কিন্তু সরকারের উদ্দেশ্য তা নয়। টিকি তার অন্যত্র বাধা।!

(৪) India-USA Nuclear Agreement (123 Nuclear Agreement) 2006 : দেশের পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে প্রচারিত। উদ্দেশ্য, বিদ্যুৎ উৎপাদনে 'সবুজ' পরমাণু বিদ্যুতের যোগান বৃদ্ধি। যুক্তি, বৃহৎ শিল্পের চাই উন্নতমানের নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ। ফলে ভারত এখন পৃথিবীর যাবতীয় বাতিল হওয়া (বিশেষ করে ফুকুসিমা প্রলয়ের পর) পরমাণু চুল্লির আস্তানা। স্থানীয় জনমত উপেক্ষা করে (তামিলনাড়ুর কুদানকুলাম পরমাণু প্রকল্প তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত) জোর কদমে এগিয়ে চলেছে পরমাণু চুল্লি নির্মাণ, কারণ ভারত এখন বিশ্বের উৎপাদন শিল্পের কেন্দ্র হতে চায়। তেজস্ক্রিয় বিষে স্থানীয় মানুষ আক্রান্ত হলে হবে!

(৫) Aadhaar 2009 (72 digit Digital National Identification Number) : এটা একটি পরিচয়পত্র, তবে নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র নয়। বলা হয়েছে—"... it only guarantees identity, not rights, benefits or entitlements"। ভোটার পরিচয়পত্র তো ছিলই তবে কেন এই বিশাল উদ্যোগ? একটাই উত্তর— অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ। তাই তথ্য প্রযুক্তির নিয়ম মেনে নতুন করে পঞ্জীকরণ। রাষ্ট্র ও বৃহৎপুঁজির লড়াই এখন এই 'আমআদমি'কে ঘিরেই। রাষ্ট্র চায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে তার নাগরিককে। নতুন তথ্যপ্রযুক্তি তার হাতিয়ার। কিন্তু প্রযুক্তির মূল নিয়ন্ত্রণ তো বৃহৎ পুঁজির হাতে! রাষ্ট্রের কাঁধে বন্দুক রেখে 'নিয়ন্ত্রিত নাগরিক'কে 'নিয়ন্ত্রিত ক্রেতায়' পরিণত করতে উঠে পড়ে লেগেছে তারা।

(৬) Coastal Regulation Zone (CRZ) Rules 2011 : বলা হলো, দেশের প্রায় ৮০০০ কিমি দীর্ঘ উপকূলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর এলাকার উন্নয়নে সামিল করা হোক। তাদের মতামত গুরুত্ব সহকারে শোনা হবে। আরও বলা হলো, উপকূলের ১০০ মিটারের মধ্যে কোন স্থায়ী নির্মাণের অনুমতি মিলবে না। তবে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিকল্প শক্তি প্রকল্পকে এই বিধিনিষেধের আওতায় বাইরে রাখা হল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৯১ সালে জারি করা বিধিনিষেধে উক্ত সীমারেখার পরিমাপ ছিল উপকূলের ২০০ মিটার পর্যন্ত। উপকূল ধরা হয় জোয়ারের সময় জল যতদূর পৌঁছায় সে রেখা বরাবর। ২০০ মিটার থেকে ১০০ মিটার নামিয়ে আনলে ক্ষতি কী? পর্যটকরা আরও একটু সমুদ্রের কাছাকাছি থাকতে পারবেন! পরিবেশ ভারসাম্য না হয় একটু নষ্ট হবে!

সমস্যা হচ্ছে, এই নতুন আইনের ফলে ভারতের লক্ষ লক্ষ গরিব মৎস্যজীবী তাদের অস্থায়ী বাসস্থান ও কাজের জায়গা হারাবেন। পর্যটন ও প্রমোটার লবি হাজার হাজার 'খটি' (মৎস্যজীবীদের অস্থায়ী বাস ও কর্মস্থান) উচ্ছেদ করে সেখানে হোটেল ও বিত্তবানের বাসস্থান নির্মাণ করবেন। এইসব 'খটি' মূলত ছোট নৌকার মৎস্যজীবীদেরই কাজের জায়গা— আধুনিক মৎস্যবন্দর নয়, যেখানে ট্রলার মালিকদের রাজত্ব চলে। এই নূতন আইনের ফলে শুধু মুম্বাই শহরের উপকূলে অবস্থিত ১৪৬টি বস্তি (খটি) উচ্ছেদের পথ সুগম হয়েছে। (The Hindusthan Times 10.1.11) একই অবস্থা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ৩৯টি খটির'। মন্দারমণিতে প্রায় দেড়শো বছর পুরানো 'দাদনপাত্রবাড়ী' খটি, যেখানে আনুমানিক ৪০০০ জন মৎস্যজীবী (১০০০ জন ধীবর ও ৩০০০ কর্মী) মাছধরার মরসুমে অস্থায়ী ভাবে বাস করেন, (কেউ নৌকা সারান, জাল বোনে, মাছ শুকান, ঝাড়াই বাছাই ও ব্যাপারির সাথে লেনদেন করেন), পর্যটন লবির কাছে এখন কোণঠাসা। শুধু পূর্বমেদিনীপুর উপকূলেই যদি ৩৯টি শতাব্দী-প্রাচীন খটি ও সেখানে কর্মরত লক্ষ লক্ষ মৎস্যজীবী এই নতুন বিধিনিষেধের জেরে উচ্ছেদের মুখে পড়ে, অনুমান করা যায় ভারতের প্রায় ৮০০০ কিমি উপকূল কত কোটি মৎস্যজীবী এই নয়া সরকারি নীতিতে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছেন। খটি-চ্যুত দক্ষ ধীবর পরিণত হচ্ছেন অদক্ষ শ্রমিকে। কেউ কেউ নাম লেখাচ্ছেন মাছধরার বড় ট্রলারে। অন্যান্যরা শহরমুখো হচ্ছেন কাজের সন্ধানে।

(৭) National Manufactutring Policy 2011 : উদ্দেশ্য পরবর্তী এক দশকে (২০২২) ভারতের জাতীয় উৎপাদনে শিল্পের অবদান ১৬ % থেকে ২৫% বৃদ্ধি করা ও অন্তত ১০ কোটি নূতন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তি নির্ভর এই উৎপাদন পরিকল্পনার অভিমুখ বিশ্ববাজার। ভারত স্রেফ সস্তার শ্রমিক ও কাঁচামালের যোগানদার। উন্নতদেশের তুলনায় শিথিল পরিবেশ রক্ষা আইনের সুযোগ নিতে পশ্চিমের দূষণকারী শিল্প স্থানান্তরিত হচ্ছে এদেশে। ভবিষ্যতে তা আরও বাড়বে।

সরকার ইতিমধ্যে দিল্লী-মুম্বাই, চেন্নাই-বাংগালুরু, বাংগালুরু-মুম্বাই ও কলকাতা-অমৃতসর, এই চারটে 'শিল্প করিডোর' নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছে। এই সব শিল্প করিডোরের দুপাশে লক্ষ লক্ষ হেক্টর জুড়ে গড়ে উঠবে National Investment and Manufacturing Zone। তাই চাই অনেক জমি, অনেক শ্রমিক, অনেক জল, অনেক বিদ্যুৎ।

(৮) FDI in Retail Trade 2012 : অনেক টানাপোড়েনের পর

ভারত সরকার ২০১২ ডিসেম্বরে বহু-ব্রান্ড (multi-brand) খুচরো ব্যবসায় ৫১ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের ছাড়পত্র দেয়। আশা করা হয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণে বিদেশি বিনিয়োগ হবে। বাস্তবে খাদ্যশস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীতে বহুজাতিক বাণিজ্যসংস্থার নিয়ন্ত্রণ বাড়বে। ভারত থেকে খাদ্যসামগ্রীর রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে পশ্চিমী দুনিয়ায়। মুনাফা লুটবে ওয়ালমার্ট-এর মত বহুজাতিক সংস্থা।

(৯) National Food Security Act 2013 : এই আইন মোতাবেক ভারত সরকার প্রায় ৬৭% নাগরিককে প্রতি মাসে মাথাপিছু ৫ কিগ্রা খাদ্যশস্য (চাল/গম) ভর্তুকি মূল্যে (subsidized rate) সরবরাহ করবে। দৈনিক ১৬৬ গ্রাম চাল বা গমে কতটা ক্ষিদে নিবারণ হবে জানি না, তবে এই উদ্যোগের ফলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (WTO) ভারতের অবস্থান যে অনেকটাই নড়বড়ে হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। পশ্চিমী দেশ সমূহের কৃষিতে মাত্রাধিক ভর্তুকি দেওয়ার বিরোধিতা প্রথম থেকেই করে আসছে ভারত, চীন, ব্রাজিল সহ উন্নয়নশীল দেশগুলো। খাদ্য ভর্তুকি দিয়ে ভারত বিশ্ববাণিজ্যে নিজেদের অবস্থান দুর্বল করল। যদিও সরকার দাবি করছে ভর্তুকি কৃষিতে দেওয়া হয়নি, ভর্তুকি কৃষিতে না ভোক্তাকে— বিতর্কের এই ঘোলা জলে পশ্চিমী দেশগুলো ভারতকে চাপ দিয়ে এদেশের বাজার আরও উন্মুক্ত করার (trade facilitation) প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে। সম্ভবত সরকার জেনেশুনেই এই 'বিল'টি লোকসভায় 'পাশ' করাতে এত উঠেপড়ে লেগেছিল। এক ঢিলে দুই মাখী মারা গেল— গরিবের বন্ধু সাজা হলো আবার দেশের বাজারও বিদেশি পুঁজির কাছে আরও উন্মুক্ত করা গেল খাদ্য সুরক্ষার আড়ালে।

অন্য আরও একটি ভয়ের দিক হলো— আনুমানিক ১.৩ লক্ষ কোটি টাকা ভর্তুকি (বর্তমান বাজার দর অনুসারে) কীভাবে বণ্টন হবে সে ব্যাপারে এখনও ধোয়াশা কাটে নি। বলা হচ্ছে, এই ভর্তুকি কৃষককে নয় ভোক্তাকে দেওয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রে এলপিজিতে ভর্তুকি দেওয়ার মত টাকা সরাসরি প্রাপকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। যদি তাই হয় তবে দেশের পাঁচ লক্ষাধিক সরকারি গণবণ্টন বিপণি, প্রচলিত ভাষায় যা 'রেশন দোকান' নামে পরিচিত, তাদের কী হবে? ভর্তুকির টাকায় ভোক্তা সরাসরি বাজার থেকে খাদ্যশস্য কিনলে গণবণ্টন ব্যবস্থার তো দরকারই হবে না তখন! ওয়ালমার্ট-এর মত বহুজাতিক জলের দরে কবজা করবে কী ফুড করপোরেশনের (FCI) হাজার হাজার গুদাম সহ গোটা গণবণ্টন ব্যবস্থা? এ আশংকা আমূলক নয়। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার নামী ব্রান্ডের পণ্যসামগ্রী গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নামী ব্রান্ডের পরিবর্তের স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা ছোট-উদ্যোগ উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী সরকারি গণবণ্টন ব্যবস্থার সহায়তা পেতে পারত। সেটাই কাম্য ছিল।

(১০) Approval of GMO Field Trial, February 2014 : নির্বাচন ঘোষণার মাত্র কদিন আগে কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ধান, গম, ভুট্টা ও তুলোর ২০০টি জি এম ওর (GMO) ফিল্ড ট্রায়ালের ছাড়পত্র দিয়েছেন। মনসান্টো, বেয়ার, বিএএসএফ ও মাহিকো-র মত বহুজাতিক কারবারিরা এবার আইনসিদ্ধ পথে ভারতের কৃষিব্যবস্থাকে ছারখার করবে। জিন পরিবর্তিত বীজের হাত ধরে সব হবে 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব' বা 'চিরসবুজ বিপ্লব'। অনুমান করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এদেশে চলবে দুধরনের চাষ পদ্ধতি—

—দেশীয় বীজে জৈব পদ্ধতিতে চাষ : মূলত দেশের বিত্তবান স্বাস্থ্য সচেতন ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে। বিদেশে রপ্তানী করতে।

—জিন পরিবর্তিত বীজে চাষ : স্বল্প দামে দেশের আম জনতার মুখে খাদ্য যোগানের তাগিদে।[৯]

(১১) Street Vendors (Protection & Livelihood and Regulation of Street Vending Act 2014 : হকার সুরক্ষার নামে স্বনির্ভর এক হকার অর্থব্যবস্থার' পরিবর্তে বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তি নির্ভর এক 'নীল অর্থব্যবস্থা' নির্মাণের উদ্দেশ্যে এক বলিষ্ঠ উদ্যোগ।

বিশ্বের অন্যতম প্রথম বহুজাতিক সংস্থা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অষ্টাদশ শতকে বাংলার কৃষককে বাধ্য করেছিল নীল চাষ করতে। বাংলার জৈব নীল ইংল্যান্ড রপ্তানি হতো চড়া দামে। মুনাফা লুটত সেই বহুজাতিক। এরপর যখন জার্মানির রাসায়নিক নীল বিশ্ববাজারে বাংলার জৈব নীলকে হটিয়ে দিল, নীলকর সাহেবরা তখন নজর দিল অন্য ব্যবসায়। ফলে পথে বসল লক্ষ লক্ষ নীল চাষি। ভেঙ্গে পড়ল বাংলার অর্থব্যবস্থা।

গত কয়েক দশক ধরে খুব পরিবর্তিত ভাবেই স্বাধীন ভারতে নির্মাণ হচ্ছে একটি 'নীল অর্থব্যবস্থা' (Indigo Economy)।[১০] এটি এমন একটি অর্থব্যবস্থা যা বিশ্ববাজারে চাহিদা নির্ভর। এই অর্থব্যবস্থা যা বিশ্ববাজারের চাহিদা নির্ভর। এই অর্থব্যবস্থা নির্মাণ করতে ধ্বংস হচ্ছে জৈব বৈচিত্র। কৃষক হারাচ্ছে বীজ নির্বাচনের মৌলিক অধিকার। স্বনির্ভর ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র উদ্যোগকারী রূপান্তরিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সরবরাহ ও বিপণন প্রক্রিয়ার এক অতি সামান্য যোগানদারে। (চিত্র ২ দ্রষ্টব্য)। পশ্চিমের দূষণকারী ভারী শিল্প স্থানান্তরিত হচ্ছে এ দেশে। জল, বায়ু, দৈনন্দিন খাদ্যে বাড়ছে বিষের কণা। এদেশের কোটি কোটি হাভাতে মানুষ প্রতিদিন এ বিষ ধারণ করছে তার শরীরে। পুরাণের মহাদেবের মত নীলকণ্ঠ হচ্ছে তারা।

বৃহৎ পুঁজির কবল থেকে কুটির ও লোক শিল্পকে রক্ষা করার সম্ভাব্য উপায়—

রাষ্ট্র ও পুঁজি দুপক্ষই প্রথামুক্ত অর্থব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে

চাইবে এটাই স্বাভাবিক। আধুনিক প্রযুক্তি তাদের এই সুযোগ করে দিয়েছে। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে — নাগরিক তার বশে থাকুক সেটাই চায় রাষ্ট্র। নিয়ন্ত্রণের এই প্রক্রিয়ায় যে নাগরিকদের কিছু সুবিধেও দেয় (আমরাও যেমন সন্তানকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে এটা ওটা কিনে দিই!) যেমন খাদ্যে ভর্তুকি, স্বাস্থ্য বিমা, সহজ ঋণ, আধার কার্ড করলে গ্যাসে ভর্তুকি ইত্যাদি। আর বৃহৎ পুঁজি নিয়ন্ত্রণ করতে চায় এক বিশাল বাজার করায়ত্ত করার তাগিদে, যা এখনও তার আয়ত্তের বাইরে, তাকে গ্রাস করার তাগিদে। তাই বৃহৎ পুঁজি রাষ্ট্রের সাথে হাত মেলায়, প্রযুক্তি ও অর্থ যোগান দেয়, তাদের অভীষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে।

চিত্র : নির্মীয়মান 'নীল' অর্থব্যবস্থা

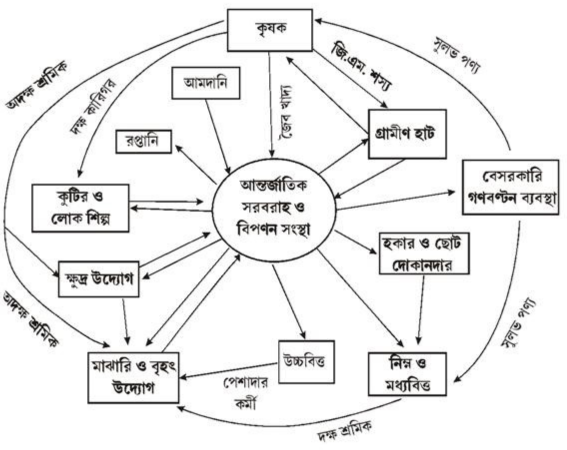

নিয়ন্ত্রকের ভূমিকার আন্তর্জাতিক সরবরাহ ও বিপণন সংস্থা

রাষ্ট্র ও পুঁজির যৌথ আক্রমণে অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থব্যবস্থা আজ বিপন্ন। বাঁচার এই লড়াইয়ে প্রাথমিক কাজ রাষ্ট্র ও পুঁজির এই অশুভ আঁতাতে আঘাত করা। বৃহৎ পুঁজির দালাল, সংখ্যাগরিষ্ঠ আমলা ও ইংরেজি জানা শিক্ষিত মধ্য ও উচ্চবিত্তের এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী রাষ্ট্রে দখল নিয়েছে আজ। শক্তিশালী মিডিয়াকে হাত করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে তাদের দলে টেনে নিয়েছে। নাগরিক অধিকার টিকিয়ে রাখতে হলে এই অশুভ গোষ্ঠীর কবল থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে হবে। নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় উদ্যোগের বিরোধিতা করে রাষ্ট্রকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে বৃহৎ পুঁজি নাগরিকদের সাথে রাষ্ট্রকেও আত্মসাৎ করতে উদ্যোগী হয়েছে আজ। কিন্তু হকার সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্ব যেভাবে আলোচ্য হকার আইনকে স্বাগত জানিয়েছেন তাতে মনে হয় তারা রাষ্ট্রের বকলমে বৃহৎ পুঁজির নিয়ন্ত্রণকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

আমরা দেখেছি, কুটির ও লোকশিল্পকেও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পালা শুরু হয়েছে পঞ্জীকরণের মাধ্যমে। নানা সুযোগসুবিধে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠতেই পারে, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে ভয়টা কোথায়? রাষ্ট্র যদি তার নাগরিককে সুরক্ষা দিতে নানা সুযোগ সুবিধে দিতে চায় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হয় যখন রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার বকলমে কুটীর ও লোকশিল্পকে আন্তর্জাতিক সরবরাহ ও বিপণন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত করে। তাদের সার্বভৌম অস্তিত্ব বিপর্জন দিতে বাধ্য করা হয়। বৃহৎ সরবরাহ ও বিপন্ন সংস্থাগুলো এই সব কুটীর ও লোক সামগ্রী নিজেদের ব্রান্ড হিসেবে বিক্রি করে। সেসব পণ্যের চাহিদা ও মুনাফা বেশি সেগুলোই তারা বেশি করে বিপণন করে। ফলে হারিয়ে যায় অনেক দক্ষ কারিগর ও বংশানুক্রমিক জ্ঞান।

ভারতের মত বিশাল দেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ কুটির ও লোকশিল্প গুটিকয় বৃহৎ বিপন্ন সংস্থার করায়ত্ত হলে বাজারের চাহিদা ও যোগান সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে তারাই। তাই সঙ্গতভাবেই মেধাস্বত্বের এক-চেটিয়া অধিকার পেতে পারে, অন্য কেউ তা বাণিজ্যিক-ভাবে ব্যবহার করলে 'রয়্যালিটি' পেতে পারে, তবে লোকশিল্পীরা তাদের লৌকিক জ্ঞানের স্বীকৃতিও মূল্য পাবেন না কেন? জয়নগরের মোয়া যদি বাক্সবন্দি হয়ে আন্তর্জাতিক বিপণন প্রক্রিয়ায় বিদেশি বাজারে অধিক মুনাফার বিক্রি হয় তবে তার একটি অংশ জয়নগরের সেই পরিবারটি, যেখানে মোয়াটি বাধা হয়েছিল, তারা পাবে না কেন? যে তাঁতির কোনো কাপড়— 'ফ্যাব ইন্ডিয়া' বা 'মঞ্জুষা' তাদের সাজানো বিপণিতে চড়া দামে বিক্রি করে যে কাপড়ের প্যাকেটে, তাতে সেই তাঁতির নাম ঠিকানা থাকবে না কেন?

কুটির ও লোকশিল্পকে বৃহৎ পুঁজির আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে হলে তার স্বকীয় স্বত্ত্বার বিশেষ জ্ঞানের স্বীকৃতি আদায় করতেই হবে। শিল্পী/কারিগরের নাম ঠিকানা থাকলে বৃহৎ বিপণন সংস্থাকে এড়িয়ে ভবিষ্যতে ক্রেতা বা ছোট বিক্রেতা সরাসরি তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। কুটির ও লোকশিল্পকে রক্ষা করতে প্রাথমিক ভাবে অন্তত সরকারি বিপণন সংস্থায় (যেমন, খাদি গ্রামোদ্যোগ, মঞ্জুষা, বিশ্ববাংলা) বিক্রিত পণ্যে প্রস্তুতকরণের নাম ঠিকানা থাকা আবশ্যিক হোক।

লোকশিল্প বাঁচবে যদি চাষি স্বাধীনভাবে চাষ করতে পারে ও দেশের বিপুল কৃষি বৈচিত্র্য রক্ষিত হয়। তা সম্ভব যদি বহুজাতিক বীজ আর জল কোম্পানি থেকে চাষি তার বীজ আর জলের অধিকার রক্ষা করতে পারে। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন দিকে দিকে 'বীজ বাঁচাও জল বাঁচাও' আন্দোলন সংগঠিত করা। যে কটা শস্য ও সবজি বীজ এখনও লুপ্ত হয়নি, অবিলম্বে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। 'জল ধর জল ভর' প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যই মাঠে মারা যাবে যদি না পাতাল জল উত্তলনের হার পর্যায়ক্রমে হ্রাস করা হয়।

চাষি বাঁচলে, কুটির ও লোকশিল্প স্বাধীনভাবে টিকে থাকতে পারলে, হকারও সুরক্ষিত থাকবে। তাই 'হকার বাঁচাও' আন্দোলনের পরিধি বিস্তীর্ণ করে একে 'হকার অর্থব্যবস্থা বাঁচাও' আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। গ্রামের কণা-আলেয়া-ফুলটুসিরা না বাঁচলে শহরের শৈবাল প্রমথেশরা বাঁচবে না। সর্বগ্রাসী পুঁজিকে ঠেকাতে বৃহত্তর প্রতিরোধ গড়তেই হবে। নয়া কোন বিকল্প পথ জানা নেই আমাদের। শুধু খেয়াল রাখতে হবে আসল লড়াইটা মেঘের সাথে নয়, মেঘের আড়ালে থাকা ইন্দ্রজিতের সাথে।

তথ্যসূত্র

১। Dipankar Dey, 2010, 'India's Urban Renewal Mission and Integration of an Informal Economy with the Globalization Process: A Paradigm Shift from Hawker Economy to Indigo Economy.' http//ssm.com/abstract= 1719444

২। Barbara Hariss-white, Valentina Prosperi, 'The Micropolitical Economy of Gains by Unorganised workers in India', *The Economic and Political Weekly*, March, 2014

৩। Dipankar Dey, Subhendu Dasgupta, 2010, 'Hawker Economy: Small Business Big Role', I & II, *Frontier*, December 12-18, 19-25.

৪। বর্তমানে হকার সংগ্রাম কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি।

৫। Tokman Victor E, 'Integrating the Informal Sector in the Moderation Process,' *SAIWS Review*, Vol. 21, No.1, 2001, pp. 45-60

৬। *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১.৪.২০১৪।

৭। বিস্তারিত জানতে দেখুন P Sainath, 'Over 2000 Fewer Farmers Everyday', *The Hindu*, May to 2013.

৮। ২০০১-২০১১ দশকে সরকারি হিসেবে ১, ৮৪, ১৬৯ জন।

৯। বিস্তারিত জানতে দেখুন, Dipankar Dey, 'FDI in Retail : Emerging Global Food Hub : Possible Consequences', *The Frontier Weekly,* May 5-11, 2013.

১০। বিস্তারিত জানতে দেখুন, Dipankar Dey, 'Of Global Warming and Indigo Economy,' *Frontier Weekly,* August, 2010.

স্বাস্থ্যনীতি, ওষুধ কোম্পানির মুনাফা আর ছাঁটাই

২০ পৃষ্ঠার পর

ভিআরএস চালু করার যে শর্তাবলী তার কোনটার সাথেই নোভার্টিসের কোন সম্পর্ক নেই। তাই নোভার্টিসের ছাঁটাই একটি বহুজাতিক সংস্থার একচেটিয়া ব্যবসা করার স্পৃহা এবং জনস্বার্থে রাষ্ট্রব্যবস্থা যেটুকু নীতি সাধারণ মানুষের পক্ষে নিচ্ছে তার বিরুদ্ধে জেহাদের ফল। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তথা তাদের দোসর কর্পোরেট পুঁজি যখন ইচ্ছে ছাঁটাই করবে আর শ্রমিকরা তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করলেই সংবাদমাধ্যমে খবর হবে— ''আরও একটা কর্মনাশা দিন''। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার 'লেবার ইন ওয়েস্টবেঙ্গল' পুস্তিকাতে কার্যত স্বীকার করে নিয়েছে যে শ্রমদিবস অনেক বেশি নষ্ট হয়েছে শ্রমিকের ধর্মঘটের কারণে নয়, মালিকদের লক-আউটের কারণে। ফলে সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়েই আজ নানা ধারার বিক্ষোভ চলছে এবং সেগুলিতে সাধারণ মানুষের অন্তর্ভুক্তি ক্রমশ বাড়ছে।

সুতরাং দেশের মানুষের স্বার্থে ছাঁটাই চাই ওষুধ শিল্পে বেড়ে চলা দুর্নীতি তথা দেশীয় একচেটিয়া কোম্পানি বা বহুজাতিক কোম্পানির একচেটিয়া বাজারজাত করার অধিকারের, ছাঁটাই চাই পুঁজির তাঁবেদারি করা রাজনৈতিক দলগুলির, ছাঁটাই চাই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির, ডিজেল ও গ্যাসের অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধির। দেশের মূলবাসী-আদিবাসীদের জল-জমি-জঙ্গলের অধিকার যারা কেড়ে নিতে চায় তাদের ছাঁটাই করতে হবে। ছাঁটাই করতে হবে ব্যাংক-বিমা শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগ, দেশের মানুষের স্বার্থে ওষুধ শিল্পে ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ, নতুন পেটেন্ট আইন, ফ্রী ট্রেড এগ্রিমেন্ট, এগ্রিকালচারাল নলেজ ইনিসিয়েটিভ, দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব, চাই বেকারি, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি ও বৈষম্যের ছাঁটাই, এবং সর্বোপরি এই উদার অর্থনীতির ছাঁটাই।

তাই আসুন, সাধারণ মানুষের স্বার্থে বিভিন্ন ধরনের ছাঁটাই-এর বিপক্ষে এবং আর অন্য কিছু ছাঁটাইয়ের পক্ষে দাঁড়িয়ে এক দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলি

আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে দুটি দল।
আর মাঝামাঝি নেই তো কিছুই
হয় মালিকের পা চাটা দালাল, আর নয়তো
এক লড়াকু মজুর হবি তুই
বল কোন দিক,, সাথী কোন দিক বল
কোন দিক বেছে নিবি তুই...

গণনাট্য আন্দোলনের প্রাক্তন কর্মী সঙ্গীতশিল্পী, সুরকার **অনল চট্টোপাধ্যায়ের** মৃত্যুতে *অনীক* গভীর শোক প্রকাশ করছে।

অন্য কথা

সুলা গায়েন : দলিত মহিলার আন্দোলনের কথা

মনোহর মৌলি বিশ্বাস

রাজা রামমোহন রায়ের থেকে বয়সে মাত্র দু'বছরের ছোট ছিলেন সুলা গায়েন। রাজা রামমোহনের জন্ম হয়েছিল ১৭৭৪ সালে, হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে, এক ব্রাহ্মণ জমিদার পরিবারে। তাঁর জন্মের দু'বছর পরে ১৭৭৬ সালে (আনুমানিক) ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণার ঠাকুরকোণা গ্রামে জন্ম হয়েছিল সুলোচনা দেবীর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত পূর্ববঙ্গ গীতিকা গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় দীনেশ চন্দ্র সেন সুলোচনার কথা লিখেছেন এভাবে— "মৈমনসিংহ নেত্রকোণার ঠাকুরকোণা গ্রামবাসিনী সুলা নাম্নী মহিলা কবি কর্তৃক গোপিনী-কীর্তন রচিত। 'সুলা' শব্দটি সুলক্ষণার অপভ্রংশ। এই রমণী আনুমানিক ইংরেজি ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে নমঃশূদ্র কূলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামদেব ও মাতার নাম জয়তারা। রবা ও দুখিয়া নামক সুলার দুইটি ভ্রাতা ছিল।"[১]

সুলোচনার যে সময়ে নমঃশূদ্র কূলে জন্ম হয়েছিল, তখন তাদের বলা হত চণ্ডাল বা চাঁড়াল। বর্ণবিন্যস্ত হিন্দুসমাজের জাতির বিচারে তারা ছিলেন একেবারে নিম্নশ্রেণীর, অস্পৃশ্য, অপাংক্তেয়। সামাজিক সম্মান তাদের একেবারেই ছিল না একথা ঠিক, কিন্তু সুললিত কণ্ঠের গায়িকা ছিলেন সুলোচনা। সুর-সাধনার মায়াজালে তিনি অতিক্রম করতে পেরেছিলেন অস্পৃশ্যতার গন্ডি। গ্রহণযোগ্য হয়েছিলেন কুলীন সমাজের মানুষের কাছে। বরাবরই ময়মনসিংহ জেলা বহু ব্রাহ্মণ কুলীন জমিদারদের বাসভূমি। জমিদার বাড়িতে তিনি প্রায়শ নগদ অর্থমূল্যের বিনিময়ে পালাগানের বায়না পেতেন।

> অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুলার নাম মৈমনসিংহ জেলার সর্বত্র প্রচারিত হইয়া গেল। এই জেলা ধনী ব্রাহ্মণদের আবাসভূমি। তাহাদের সমস্ত পার্বণ ও উৎসবে সুলা আহুত হইত। যে আসরে সুলা নাই, সে আসর জমিত না। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুলা প্রচুর অর্থলাভ করিয়াছিল। প্রতিটি পালাগানের জন্য এক রাত্রে সুলা দশ হইতে পঁচিশ টাকা পর্যন্ত পারিশ্রমিক পাইত। এছাড়া সমৃদ্ধ ঘরের মহিলারা সুলাকে মুক্ত হস্তে বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দান করিতেন। খাগড়ার রাণা সুলাকে ছত্রসাল গ্রামে অনেক নিষ্কর জমি প্রদান করিয়া ছিলেন। সম্ভবত, ১৮৬৬ সালে বৃদ্ধ বয়সে সুলার ভবলীলার অবসান হয়। বিদেশীয় পাঠকেরা ইহার কবিতার মূল্য কতটা দিবেন জানিনা। সুলা স্বধর্মে নিষ্ঠাবতী ছিল এবং তার কবিতা হিন্দুদের চিরন্তন সংস্কারের বিশেষ রূপ অনুকূল। অপরের পক্ষে তাহা কতটা উপযোগী হইবে তাহা বলা যায় না। ইংরেজ কবি মিসেস হিমান্সের লেখায় যেরূপ অনাড়ম্বর সারল্য দৃষ্ট হয়, সুলা গায়েনের কবিতাতেও সেরূপ একটা সরলতা আছে।[২]

নিরক্ষর পরিবারের এক নিরক্ষর কন্যা কাব্য রচনা করেছেন, বাঙলা সাহিত্যের এ ইতিহাস বিরলদের মধ্যে বিরলতম। তার বিষয়ে জানার কৌতূহল সব সময়ে এক নির্দিষ্ট মাত্রা লাভ করে পাঠকদের কাছে। সুলার বিষয়ে যা সবথেকে বড় আগ্রহ তৈরি করে তা হল, বাঙলার এক প্রান্তিক সমাজে জন্মলাভ করেও এক নিরক্ষর মেয়ে বিয়ের বহু বছর পরে কী করে প্রবল আন্দোলন করে লেখাপড়া শেখার কাজটা করেছেন, তার সেই অসাধারণ মনন দৃঢ়তাকে সম্ভ্রম জানাতেই হয়। সেই সময়েতে যা সামাজিক অবস্থা ছিল, সেই মত করে একেবারে অল্প বয়সে, মাত্র এগার-বারো বয়সে তার পিতা রামদেব তার বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। ঠাকুরকোণা গ্রাম থেকে কয়েক গ্রাম দূরে বাড়ি ছিল জয়হরির। সতের-আঠারো বছর বয়সের এক সুদর্শন যুবকের সাথে বিয়ে হয় সুলোচনার। রামদেবের ইচ্ছা ছিল জয়হরিকে তিনি ঘরজামাই করে রাখবেন। ওই প্রকারের এক ভাবনায় জয়হরিকে তিনি জামাই হিসেবে বরণ করেছিলেন।

জয়হরি একেবারে বাল্যকাল থেকে ছিল ভাবুক প্রকৃতির মানুষ। সংসার জীবনের প্রতি তার কোনও প্রকার আগ্রহ ছিল না। সংসারবিমুখী এক আধ্যাত্মিক টান বার বার আকর্ষণ করেছিল তাকে। কোনও একদিন সবার অলক্ষ্যে জয়হরি ঘর থেকে নিরুদ্দেশে যাত্রা করে। সেই থেকে জয়হরি নিরুদ্দেশ। তার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

নিরক্ষর কন্যা সুলোচনা এক সময়ে যুবতী হয়ে উঠলেন। যৌবনকে তিনি আত্ম-শাসনে রেখেছিলেন পাঠাভ্যাসের মধ্যে মনোনিবেশ করে। সুলোচনা মনে করতেন, তাঁর স্বামী বেঁচে আছে, কোনও একদিন ফিরেও আসবে সে। একদিকে পাঠাভ্যাস অন্যদিকে নিজস্ব সুললিত কণ্ঠের সঙ্গীত সাধনা, এই দুই সাধনা মিলে তাঁকে নতুন পৃথিবীর পথ দেখিয়েছিল। শাখা-সিঁদূর নিয়ত পরতেন। সেই সময়ে এই গৃহবধূ তার বাড়ি থেকে কয়েক গ্রাম দূরের এক পুরুষ গৃহশিক্ষকের বাড়িতে নিয়ত পড়তে যেতেন এবং এক মনোযোগী ছাত্রী হয়ে উঠেছিলেন। নারী হয়েও লেখাপড়া শিখতে হবে, এই মানসিক সাহস তাকে নারী-জীবনের সীমাবদ্ধ গণ্ডি ভাঙতে পথ দেখিয়েছে। তার সম্পর্কে একটি মূল্যবান মন্তব্য করা হয়েছে— "যেমন তিনি বঙ্গের প্রথম রমণী, যিনি প্রকাশ্যে পুরুষ শিক্ষকের কাছে বিদ্যা অভ্যাস করে এক বৈপ্লবিক কাজ করেছেন, তেমনি বৈরাগ্য নিয়েও শাখা-সিঁদূর না ছেড়েও আর এক সামাজিক বিপ্লব করে গিয়েছেন।

যতদিন পর্যন্ত মা-বাবা জীবিত ছিলেন, ততদিন সুলোচনা ঠাকুরকোণার পিতৃগৃহেই ভাই রবা ও দুখিয়ার সাথে বসবাস করতেন। পিতামাতার মৃত্যুর পরে ঠাকুরকোণা গ্রাম ছেড়ে ছত্রশাল গ্রামে তার এক ভাগ্নের বাড়িতে ওঠেন। প্রকৃতপক্ষে ওই গ্রামে বসবাস করার প্রধান কারণ হল লেখাপড়া শেখা। ছত্রশাল গ্রামের ছন্নুনাথ পাঠশালার শিক্ষক ছড়ুনাথ ওই অঞ্চলে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি শুধু একজন নামকরা শিক্ষকই ছিলেন না, অতি দয়ালু হৃদয়ের মানুষ হিসাবে সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন।"[৩]

অস্পৃশ্য ঘরের এক নিরক্ষর কন্যার কথা চিরকাল সবার অজানা থেকে যেত যদিনা ময়মনসিংহ জেলার বিখ্যাত জমিদার বিজয় নারায়ণ আচার্য মহাশয়ের নিজস্ব সংগ্রহে সুলোচনার নিজের হাতে লেখা ওই 'গোপিনী-কীর্তন' পালাটি রক্ষিত না থাকত। তাঁর কাছ থেকে ওই পালাটি সংগ্রহ করেছিলেন চন্দ্রকুমার দে এবং সুলোচনার জীবন-সম্বলিত বহু তথ্যও তিনি জমিদার পরিবার থেকে যেমন পেয়েছিলেন তেমনি আরও বহু স্থানে ঘুরে ঘুরে পেয়েছিলেন। সুলোচনার জীবন-কাহিনি সহ তাঁর কাব্য প্রতিভার কথা।

দীনেশ চন্দ্র সেন তার কাব্য প্রতিভার আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর গানের কথাই অনেক জোর দিয়ে বলেছেন। দীনেশ চন্দ্র সেনের কথা— "সে স্বীয় বিশ্বাসের উন্মাদনায় যখন নিজের গানগুলি গাহিত তখন তাহা শ্রোতৃবর্গের যেরূপ হৃদয়গ্রাহী হইত, এখন কবিতা হিসাবে পাঠ করিয়া আমাদের পক্ষে অতটা আনন্দ লাভ করা সম্ভব নয়। তথাপি ইহাদের একটা নিবিড় ভক্তিপ্রাণ উচ্ছ্বাস আছে, যাহা পাঠকদের হৃদয়কে স্পর্শ করিবেই করিবে। আমরা শিক্ষার অভিমানে আমাদের হৃদয় যতই অগর্লবদ্ধ রাখি না কেন, কৃষ্ণলীলার মাধুর্য তাহাতে প্রবেশ করিবার অবকাশ করিয়া লইবে।"[৪] ভক্তিরসের অমিয়ধারা বিত্তবানদের যতটা বিগলিত করে, বিত্তহীনদের করে তার থেকে অনেক বেশি। শ্রীচৈতন্য হাড়ি-মুচি-মেথর-ডোমদের হৃদয় যতটা আপ্লুত করতে পেরেছিলেন সমাজের উচ্চবিত্তকে সেভাবে করেননি। সুলাও বৃহত্তর জনসমাজের কাছে কতটা আপন হয়েছিলেন তা এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস।

সুলার মধ্যে পক্ষবিস্তার করেছিল দৈন্যক্লিষ্ট সমাজ ও সংসারের মানুষ। তাঁর সৃজনী প্রতিভার মধ্যে তাই যিশুর হৃদ্‌বিদ্ধ প্রেম খুঁজে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গ নিয়ে সুলোচনার কথা দীনেশ চন্দ্র সেন প্রকাশ করেছিলেন এইভাবে— "যাহারা খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী তাহারা এই কীর্তনগুলির মধ্যে বাইবেলের একটা সাদৃশ্য অনুভব করিবেন। খ্রিস্ট্রীয় ও কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় লীলার স্থানে স্থানে একটা অজ্ঞাত সাম্য ও ঐক্যরেখার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা বাইবেলের স্তোত্রগুলির (Psalms) ২৫,১১; ৩১,৩; ৩৪,৩; ৬৬,২; ৬৯,৩০; ৭২,১৭; ১৪৫,১; ১৪৮,৫; ১৪৮,১৩; ১৪৯,৩; ১৫০,৪ সংখ্যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বৈষ্ণবপদে ও কীর্তনে ইহাদের অনুরূপ অনেক পদ পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া 'সোলেমানের গানের' অনেক কথা বৈষ্ণবপদাবলীর, এমনকি এই গোপিনী-কীর্তনেও পাওয়া যাইবে। সুধী পাঠকের এই সমস্যার সমাধান করা একটা গুরুতর কর্তব্য। অবশ্য 'গ্রাউজ' (Growse) প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই বিষয় লইয়া সামান্য আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু কোনও পূর্ণাঙ্গ বিচার হইয়া যায় নাই।"[৫]

নারী জীবনের এক চরম সংকটের মধ্যে পড়তে হয়েছিল সুলা দেবীকে। একজন উচ্চশিক্ষিত রমণীর পক্ষেও যে সংকট অতিক্রম করা খুব সহজ ছিল না, স্থিতধী এবং শান্ত চিত্তে সেই পাহাড়প্রমাণ সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুলোচনা তাঁর জীবনটাকে আঁকাবাঁকা পথে না নিয়ে এক পবিত্রতর সারল্যের মধ্যে বেঁচে থাকার সামগ্রীতে পরিণত করতে পেরেছিলেন। তার জন্য তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতেই হয়। প্রতিটি মানুষের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে বহু সৎ গুণ। বিপদের দিনে সেই সৎ গুণগুলিকে যদি আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করা হয়, তা বেঁচে থাকার পথ দেখিয়ে দেয়— মসৃণ সেই যে সতত সুন্দর পথের খোঁজ করে ক'জনে সার্থক হতে পারে! হ্যাঁ, সুলা সার্থক হয়েছিলেন।

স্বামীর সাথে কখনো মনান্তর কিংবা মতান্তর তৈরি হয়নি তাঁর, তাঁর স্মৃতিচিহ্ন হৃদয় থেকে একদিনের জন্যও মুছে ফেলবার চেষ্টা করেননি। জৈবিক তাড়নাকে মানুষ যখন তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর করে তুলতে পারে সেখানেই প্রতিভাসিত হয় নৈসর্গিক প্রেমের মহিমা। সুলোচনা সেই প্রেমের কালোত্তীর্ণ এক মহীয়সী নারী। দীনেশ চন্দ্র সেন যথার্থভাবে বলেছিলেন, "সুলার কলঙ্কভঞ্জনের অধ্যায়টি বিশেষরূপে উপাদেয়। ভগবানকে সে প্রাণ দিয়া ভালোবাসে অথচ মুখে কথাটি নাই। অপরদিকে যে আচার বিচার লইয়া চিৎকার-ফুৎকার পূর্বক ধর্মের মূল সূত্রটি ভুলিয়া যায় এই উভয় শ্রেণীর প্রকৃত বিচার ভগবান নীরবে করিয়া থাকেন। দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মত কলঙ্ক ভঞ্জনের আখ্যায়িকার রূপকে এই তত্ত্বটি বঙ্গীয় বৈষ্ণব করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন। এইসব পৌরাণিক গল্পকে অলৌকিক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না; ইহার ভিতরে বুঝিতে হইবে। অলৌকিক গল্পে তো চক্ষু অশ্রুতে আর্দ্র হয় না, মন এমন করিয়া কাঁদিয়া ওঠে না। আরব্য উপন্যাস পাঠ করিলে বালকদের মনে উৎসাহ, কৌতূক ও স্ফূর্তি বাড়িতে পারে, কিন্তু কলঙ্কভঞ্জন পড়িয়া মন করুণায় ভাসিয়া যায়। সুলা গায়েনের কবিতাটি পাঠ করিলে পাঠক এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিবেন।"[৬]

সুলার শ্রীশ্রী গোপিনী-কীর্তন পালাটি[৭] সম্পূর্ণভাবে অপরিবর্তিত রেখে দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর মৈমনসিংহ গীতিকায় স্থান দিয়েছেন। পালায় সুলা কখনো নিজেকে অনাথিনী বলেছেন, কখনো নিজেকে এক চণ্ডাল দুহিতা বলেছেন, কখনো

এর পর ৩৯ পৃষ্ঠায়

স্মরণ

পিট সিগার-এর গান : আমাদের অনুভব

গণবিষাণ

পিট সিগারের মৃত্যুর পর *অনীক* 'গণবিষাণ'-কে অনুরোধ করে পিট সিগার সম্পর্কে তাঁদের ভাবনা *অনীক*-এর পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে। 'গণবিষাণ'-এর বন্ধুরা আমাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে আমাদের সঙ্গে একটি ঘরোয়া আলোচনায় মিলিত হন। সেই আলোচনার ভিত্তিতে বর্তমান লিপিটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

পিট সিগারের প্রতি আমাদের যে আগ্রহ, তাঁর প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, সেটা জাগতে শুরু করে যখন আমাদের অনেকেই কলেজ জীবনে। সময়কালটা ১৯৭৫-৭৬। সেই সময় থেকে আমরা পিট সিগারের গান শুনতে শুরু করি। তারপর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্বে পিট সিগার আমাদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আমরা তখন নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করতে শিখছি— পিট সিগারের গান আমাদের কাছে তখন এক নতুন মাত্রা নিয়ে হাজির হয়। আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা সেই পর্বে খুব সুস্পষ্ট হয়ে গেছে এমনটা নয়, কিন্তু ভাবনাচিন্তা নির্মাণের পর্ব যে শুরু হয়ে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

আমাদের সেই সময়টা বড়ো বিচিত্র ছিল। আমাদের বেড়ে ওঠার সেই সময়টায় নকশালবাড়ি আন্দোলন প্রায় অস্তমিত, অনেকেই তখনও কারান্তরালে। কেউ কেউ ১৯৭৭-র বন্দিমুক্তি পর্বে সবে কারাগারের বাইরে আসতে শুরু করেছেন। সেই পর্বে আমরা পিট সিগার নিয়ে খুব একটা আলোচনা করেছি এমনটা নয়, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যাঁরা পিট সিগারের গানগুলি নিয়ে খুবই আলোড়িত হতেন। সেই সময়ে গণবিষাণে অনেক মানুষ ছিলেন যাঁরা চটপট গান লিখতে পারতেন, দ্রুত অনুবাদ করতে পারতেন, গানে সুর সংযোগ করতে পারতেন। সেই সময় আমাদের একজন সমসাময়িক বন্ধু, সুনীত সেন, পিট সিগারের "হুইচ সাইড আর ইউ অন..." গানটি অনুবাদ করে। গানটি গণবিষাণের গানগুলির মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় গান বলা যায়। সাধারণভাবে আমরা দেখেছি যে শ্রমিকদের মধ্যে গানটি খুবই গ্রহণযোগ্য হয়েছে। কিন্তু যখন হয়ত ছাত্রদের একটা অনুষ্ঠানে গেছি, বা সাধারণ অফিস-কাছারির অনুষ্ঠানে গানটি করেছি— সেখানে আমরা না শ্রোতাদের মধ্যে খুব আলোড়ন দেখেছি, না আমরা নিজেরা তেমনভাবে আলোড়িত হয়েছি। তবু আমরা এই গানটা সব জায়গাতেই করতাম, সঙ্গে জুড়তাম ব্রেখ্‌ট-এর সেই গানটা— "জামা যখন ছিঁড়তে থাকে, ছিঁড়তে ছিঁড়তে ফর্দাফাই..."। কিন্তু আমরা দেখছিলাম যে কোনো কারণেই হোক, গানগুলোর ধার যেন চলে যাচ্ছিল। আমাদের মনে হচ্ছিল, আমরা যেন শ্রোতাদের মনের মধ্যে ঠিকমতো ঢুকতে পারছি না।

সেই সময় কানোরিয়ার একটি অবস্থান আন্দোলনে গণবিষাণ আমন্ত্রণ পেয়ে হাজির হয়। সেই সময় শ্রমিক আন্দোলনের খুবই স্তিমিত অবস্থা, প্রায় কোথাও কোনও আন্দোলন নেই। এমন একটা সার্বিক পরিস্থিতিতে এমন একটা জমায়েতে উপস্থিত হওয়াটা আমাদের কাছে খুবই বড়ো একটা বিষয় ছিল। কারখানা গেটে অনুষ্ঠানটি হচ্ছে। একটা ছোট্ট টেবিলের ওপর একটা হারমোনিয়াম, জলিদি সেটা বাজাচ্ছেন। আমাদের সামনে ঐ চারহাজার উৎসুক মুখ— সেটাই আমাদের প্রেরণা জোগালো। সেখানে আমরা পিট সিগারের "কোনদিক সাথী..." বা ব্রেখ্‌ট-এর "আমাদের জামা..." গাইলাম। আমাদের তখন মনে হলো, এই গানগুলো গাওয়ার ঠিক জায়গায় এতদিনে আমরা পৌঁছতে পেরেছি। আমাদের মনে হলো যে ঐ শ্রমিকদের কথা বুঝি আমাদের মুখে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই গানটার প্রেক্ষিতটি আমরা পরে আরও স্টাডি করেছি। কয়লাখনি শ্রমিকদের ধর্মঘট— ফ্লোরেন্স রীভ্‌স প্রায় ৯২ বছর বয়সে এই গানটিই গাইছিলেন। তাঁর গলা কেঁপে যাচ্ছে, কিন্তু গানটার মধ্যে যে সত্তাটা রয়েছে সেটা কিন্তু স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। গানের মধ্যে যে একটি আকুল আবেদন রয়েছে, সেটা কিন্তু পিট সিগার আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছেন। ব্যাঞ্জো বাজিয়ে সাধারণ চেহারার একজন গান গাইছেন, এটা আমাদের আকর্ষণ করতো।

এরপর পিট সিগারের আর একটি গান অনুবাদ করি। গানটি ছিল— "হোয়াট ডিড ইউ লার্ন ইন স্কুল টুডে..."। গানটার অনুবাদ করেছিলেন সজলদা। এই গানটিও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে। যখন আমরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ বা অন্যত্র ছাত্র সমাবেশে এই গানটা করতাম, তখন বুঝতাম যে ছাত্ররা এটা গ্রহণ করছে। এই গানটা একটা আশ্চর্য আবেদন নিয়ে হাজির হতো। যেখানে আমরা তীব্র ব্যঙ্গ করে বলতাম, "পুলিশ হলো বন্ধু আমার, গরিব আদালতে পায় সুবিচার...", বিষয়টা তাদের অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। সেই জায়গাটা থেকে ছাত্ররা খুবই প্রেরণা পেত।

এছাড়া পিট সিগারের অন্য যে সব গান আমরা সব সময়েই করতাম, তার একটা হলো "হোয়ার অল দা ফ্লাওয়ার্স গন..."। গানটির নানান রূপ রয়েছে। পিট সিগার যে রূপটি

গাইতেন তার মজাটা এটাই যে তিনি গানের বাণীতে একটা ছোট্ট পরিবর্তন করলেন, ফলে গানটির মধ্যে অদ্ভুত একটা মাত্রা সংযোজিত হয়ে গেল। এই যে ছোট ছোট পরিবর্তন পিট সিগার অবলীলাক্রমে করতেন এবং তা গানটিকে একটি নতুন মাত্রা দিয়ে মানুষের মনে আবেদন জাগাত।

পিট সিগারের গায়কী আমরা অনেকেই আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছি। গান করতে করতে হয়ত মাঝে একটু কথা বলে নেওয়া, তারপর আবার গান করা, কখনও গানটাকে একটু ব্যাখ্যা করা। এগুলোর সবকটাই আমরা এক সময়ে করার চেষ্টা করেছি। যখন আমাদের প্রচারমূলক কাজ করতে হয়েছে, যখন অবস্থাটা অ্যাজিটেশন-এর পর্যায়ে, তখন আমরা এটা খুবই করেছি।

এইভাবে পিট সিগারকে নাড়াচাড়া করতে করতে আমরা এমন অনুষ্ঠান করতে শুরু করলাম যেখানে পিট সিগারের বাংলা অনুবাদে একজন গাইছি, অন্য একজন গানটা ইংরাজিতে গাইছে। আমাদের বন্ধু সঙ্গীতবোদ্ধা প্রবুদ্ধ-র সঙ্গে আমরা এমন অনুষ্ঠান করেছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই সময়ে যে গানটা খুবই আলোড়ন তুলত সেটি পিট সিগারের "গারবেজ..."। এখন মনে হচ্ছে গানটা বুঝি আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। যতবার "গারবেজ" কথাটা আসছে, ততবার তাঁর বলার ভঙ্গির মাধ্যমে তিনি সামাজিক আবর্জনাকে মূর্ত করে তুলছেন। এই গানটা তখন আমাদের খুবই আলোড়িত করত।

আমরা যখন গাইতে শুরু করছি তখন কোথাও কোনও আন্দোলন নেই— আবার অন্যদিকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের মধ্যে ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলি একজায়গায় আসার চেষ্টা করছে। এই মেলার চেষ্টাটা একদিক থেকে নতুন করে আশা জাগাচ্ছিল। (কিন্তু এইসব মঞ্চগুলো একে একে ভেঙ্গে যায়।) আমাদের সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে যদি দেখেন, তখন আমাদের সঙ্গেই অন্তত ৫০-৬০টি গানের গোষ্ঠীর সক্রিয় যোগাযোগ ছিল যারা নিয়মিত গান গাইত। হাজরা পার্কে প্রতি শনিবার গণমঞ্চ হতো, যেখানে নিয়মিত গান হতো। সেই সময় মে দিবসে যে কোনো পেশাদারি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর থেকেও আমরা বেশি ব্যস্ত থাকতাম। শ্রমিক মহল্লায় গানের অনুষ্ঠানের ডাক পড়ত। এখানে আমরা "উই শ্যাল ওভারকাম..." একেবারে পিট সিগারের ঢং-এ গাইতাম। অন্য অনেকেই যারা কেবলমাত্র মঞ্চেই গানের অনুষ্ঠান করতেন, তাঁরা পিট সিগারকে যেমনভাবে শ্রোতাদের কাছে উপস্থাপিত করতেন, আমরা মঞ্চের বাইরে পিট সিগারকে প্রথম থেকেই অন্যভাবে উপস্থাপিত করতে প্রয়াসী ছিলাম।

"উই শ্যাল ওভারকাম..." গানটি নিগ্রো স্পিরিচুয়াল হলেও আমরা তো আর সেই জায়গায় নেই। স্পিরিচুয়াল থেকে সংগ্রামের জায়গায় নিয়ে যাওয়া, আমরা এটা সচেতনভাবেই করে এসেছি।

যখন আন্দোলনের জোয়ার স্তিমিত হয়ে আসছে, তখন আমাদের মনে হচ্ছিল যে খুব কমই জায়গা আছে, যাকে ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো করে আঁকড়ে ধরা যায়। এমন এক আন্দোলনহীন নিবাত পরিস্থিতিতে একটা মানুষ লাইটহাউসের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় সম্মান পেলেন একেবারে শেষ বয়সে। সারাটা জীবনই তিনি দেখিয়েছেন যে, যেখানেই প্রতিবাদ, সেখানেই পিট সিগার। আমরা জো হিল-এর গান করেছি। সেই মর্মে পিট সিগার নিজেই যেন এক সত্যিকারের জো হিল, যাঁকে আমরা চোখের সামনে দেখেছি।

১৯৯৬ সালে পিট সিগার যখন কলকাতায় এলেন (এর আগের বার যখন এসেছিল, তখন আমরা অনেকেই তাঁকে দেখার বা জানার মতো বয়সে ছিলাম না), যখন তাঁকে সামনাসামনি দেখলাম, দেখলাম কত মানুষ পিট সিগারকে নিয়ে ভাবেন। এর আগে আমাদের ধারণা ছিল আমাদের মতো ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলিই বুঝি পিট সিগারকে নিয়ে ভাবে। নজরুল

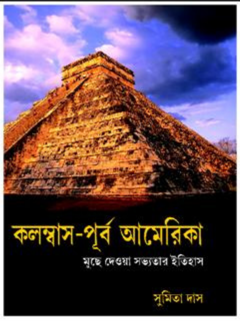

৫০০ বছর আগে কলম্বাস আমেরিকার মাটিতে পা দেওয়ার আগে পর্যন্ত আমেরিকার অজানা ইতিহাস— তার কৃষি থেকে নগরসভ্যতা, তার শিল্প-স্থাপত্য, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, রাজনীতি-সমাজ নিয়ে এই বইটি চিন্তার নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।

কলম্বাস-পূর্ব আমেরিকা ২০০.০০

মুছে দেওয়া সভ্যতার ইতিহাস

সুমিতা দাস

পিপলস বুক সোসাইটি

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট (দ্বিতল)

কলকাতা ৭০০০০৯, ফোন : (০৩৩) ২২১৯-৯২৫৬

মঞ্চ বা কলামন্দির উপচে পড়ছে, এক সময় পিট সিগার বলছেন বাইরের মানুষদের ভেতরে আসতে দাও।

এর থেকে বোঝা যায়, আন্দোলন যেমন কোথাও ভৌগোলিক সীমা মানেনি, সাথে সাথে পিট সিগারের গানও ভৌগোলিক সীমানায় সীমাবদ্ধ থাকেনি।

পিট সিগারের "হুইচ সাইড আর ইউ অন..." গানটি আমরা বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলে গাওয়ার পর রাস্তায় সাধারণ মানুষ আমাদের ধরে বলেছে, আপনাদের ঐ গানটা একটা দারুণ গান। এই গানটা অদ্ভুতভাবে আপামর জনসাধারণকে সংযুক্ত করে দিতে পারে। এই গানটি মানুষকে একটি সুস্পষ্ট অবস্থান নিতে উদ্বুদ্ধ করে।

পিট সিগার সম্পর্কে একটি বই এবং দুটি ক্যাসেট আমাদের অনেকেরই পিট সিগার সম্পর্কে অবলম্বন ছিল। আমরা পিট সিগারের গায়নভঙ্গিটি বোঝার চেষ্টা করেছি।

পিট সিগারের অনেক গানের মূলটি প্রোথিত আছে হয় গসপেল্ বা লোকগান বা নিগ্রো স্পিরিচুয়ালের মধ্যে। পিট সিগার অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের ইতিহাসে চলমান গানগুলিকে অবলম্বন করে সামান্য পরিবর্তন করে তাতে মাত্রা যোগ করেছেন। এটা হয়ত পিট সিগারের রাজনীতির একটা অঙ্গ। বাইবেলে পরিচিত গানের পুরোটা অবিকৃত রেখে তিনি শুধু প্রথমে জুড়ে দিলেন "টার্ন টার্ন টার্ন"। বৌদ্ধিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে অসম্ভব ধী-সম্পন্ন না হলে একজনের পক্ষে সম্পূর্ণ একটি ধর্মীয় সঙ্গীতকে একেবারে অন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়া কঠিন।

এখন ইউ-টিউবের কল্যাণে আমরা দেখতে পাচ্ছি পিট সিগার কেমনভাবে দশকে দশকে গানের পরিবেশনার স্টাইল বদলাচ্ছেন। আমাদের বারবার মনে হয়েছে যে যদি শুনে শুনে গানটা তুলতে হয় তবে তাঁর গাওয়া কোন্ রূপটি আমরা অনুসরণ করব। পিট সিগার স্বাভাবিক শব্দভিত্তিক যন্ত্রানুষঙ্গ পছন্দ করতেন। এই নিয়ে বৈদ্যুতিন বা সিন্থেটিক যন্ত্র ব্যবহারকারীদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয়। তাঁর গায়নভঙ্গিতে নাটকীয়তা ছিল না বললেই হয়। কিন্তু ব্যঙ্গ এবং তীক্ষ্ণতার তাতে অভাব ঘটেনি। তাঁর প্রকাশভঙ্গিতেই একটা সূক্ষ্ম নাটক লুকিয়ে থাকে।

পিট সিগারের কাছ থেকে আমাদের কী শেখার আছে? পিট সিগারের কাছ থেকে আমরা শিখেছি যে মানুষকে ভালোবাসো। মানুষের কাছে যাও। মানুষের মধ্যে চলমান যে ধর্মীয়, আঞ্চলিক গান রয়েছে সেগুলিকে আত্মস্থ করো। আত্মস্থ করার পর সমাজ পরিবর্তন করার যে বিরাট স্রোত রয়েছে, তার সঙ্গে মিশিয়ে দাও। একনিষ্ঠতা ছাড়া এটা হতে পারেনা। পিট সিগারের গান গাওয়ার সময় পিট সিগারের মধ্যে থাকা এই ভেতরের কথাটাও আমাদের নেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

সুলা গায়েন : দলিত মহিলার আন্দোলনের কথা

৩৬ পৃষ্ঠার পর

স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন আমার প্রাণনাথ। বারবার কৃতজ্ঞচিত্তে তার শিক্ষাগুরু ছড়ুনাথের কাছে তার লেখার শক্তি যাচাই করেছেন। স্বামীকে মনে করেছেন এইভাবে—

স্বামীর চরণ বন্দি ভক্তিযুক্ত হইয়া।
বিদেশে গেল আর না আইল ফিরিয়া।।
যেখানে সেখানে থাকে মোর প্রাণপতি।
তোমার চরণে যেন থাকে মোর মতি।।
যা হবার হইয়াছে কপালের লেখা।
মরণের দিনে দিও এ দাসীরে দেখা।।[৮]

প্রসঙ্গ সূত্র

১) দীনেশ চন্দ্র সেন, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রকাশিত), ১৯৩০, পৃ. ৪৪৩।
২) ঐ, পৃ. ৪৪৫
৩) রেণুকা বিশ্বাস, উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সুলোচনা : আধুনিক যুগের পাঠশালায় পুরুষ শিক্ষকের হাতে প্রকাশ্যে শিক্ষিতা প্রথম বঙ্গনারী, এন সি এম বি মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, ১ম সং, ২০০৬, পৃ. ৮
৪) সূত্র ১, পৃ. ৪৪৬
৫) সূত্র ১, পৃ. ৪৪৭
৬) সূত্র ১, পৃ. ৪৪৮
৭) সূত্র ১, পৃ. ৪৪৯-৪৯১
৮) সূত্র ৩, পৃ. ২৩

দীপংকর চক্রবর্তী : নির্বাচিত রচনা (১ম খণ্ড)
২০০৲

দীপংকর চক্রবর্তীর রাজনৈতিক লেখাগুলির একটি সংকলন

pbs
পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট (দ্বিতল)
কলকাতা ৭০০০০৯, ফোন : (০৩৩) ২২১৯-৯২৫৬

স্মরণ : বনবিহারী চক্রবর্তী

প্রবীণ বিপ্লবী, কমিউনিস্ট নেতা ও শিক্ষক বনবিহারী চক্রবর্তী (১৯২৪-২০১৪) গত ১৪ এপ্রিল প্রয়াত হয়েছেন।

হুগলি জেলার নালিকুলের কেশবনগর গ্রামের নিতাই চক্রবর্তী ও নন্দরাণী দেবীর সেজ ছেলে বনবিহারী। তাঁর বছর পাঁচেক বয়স থেকে তাঁর পরিবার হুগলির শ্রীরামপুরে বসবাস করতে থাকে। তরুণ বয়সেই তিনি বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য হয়ে ওঠেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি কাশী চলে যান। '৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যুক্ত থাকার সময় বেনারসের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় এবং তরুণ বনবিহারী কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। পার্টির নির্দেশেই তিনি আরো অনেক কমরেডের মতো সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। সেই সময় অস্ত্রাগারে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বহু শ্রমিক নিহত হন এবং কর্তৃপক্ষ আদেশ করে ঐ শ্রমিকদের নাম হাজিরা খাতা থেকে বাদ দিয়ে দিতে। এই অনৈতিক কাজ করতে অস্বীকার করে বনবিহারী আন্দোলনরত গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগ দেন, এবং সেনাবাহিনীর কোর্ট মার্শাল এড়াতে আত্মগোপন করেন। পার্টির সবসময়ের কর্মী হিসাবে তিনি ছাত্র ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে কাজ শুরু করেন। তাঁর জীবনব্যাপী তত্ত্বচর্চারও শুরু এই সময়েই। পার্টি সদস্যপদ প্রাপ্তি ঘটে ১৯৪৪ সালে।

১৯৪৮ সালে রণদিভে লাইন গ্রহণের পর কমিউনিস্ট পার্টির উপর নেমে এলো রাষ্ট্রের প্রবল আক্রমণ। আবার আত্মগোপন করতে হয় তাঁকে। ইতিমধ্যে বিয়ে হয়েছিল বেনারসেরই অঞ্জলি ব্যানার্জীর সাথে। এবার তিনি আসেন হাওড়ায়। কাজ শুরু করেন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী হিসাবে। উত্তরপ্রদেশে থাকাকালীন তিনি পার্টির একজন চিন্তাশীল, তাত্ত্বিকভাবে অগ্রসর কর্মী হিসেবে খ্যাত ছিলেন। হাওড়ায় ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক সংগঠক হিসেবে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য।

ভারত-চীন যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক মহাবিতর্কর ফলশ্রুতিতে পার্টি ভাগ হয় ১৯৬৪ সালে। বনবিহারী চক্রবর্তী পার্টির বিপ্লবী অংশটির সঙ্গে সিপিআই(এম)-এ যোগদান করেন। কিন্তু খুব অল্পদিনের মধ্যেই আরও বহু পার্টি সদস্যের মতো তিনিও আবিষ্কার করেন যে নতুন পার্টি নেতৃত্বও বিপ্লবী গণলাইনের বদলে সংসদীয় সুবিধাবাদকেই বেছে নিচ্ছে। এই সত্য আরও স্পষ্ট হলো '৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন নকশালবাড়িতে আন্দোলনরত কৃষকদের ওপর গুলি চালালো।

সাম্রাজ্যবাদের আর্থিক সংকটের চরিত্র উন্মোচনে বনবিহারী চক্রবর্তী লেখেন, *ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন* (১৯৬৬)। নকশালবাড়ির সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের লাইনকে সমর্থন করায় ১৯৬৭ সালে তিনি সিপিআই(এম) পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন এবং নবগঠিত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয়, AICCCR-এ নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা পালন করেন ১৯৬৯ সালে AICCCR-এর যে সভার মঞ্চ থেকে কানু সান্যাল সিপিআই(এমএল) পার্টি গঠনের ঘোষণা করেন, সেই সভায় হিন্দীতে বক্তৃতা দেন বনবিহারী। ১৯৬৯ সালেই তিনি লেখেন *চীন বিপ্লবের শিক্ষা*।

সিপিআই(এমএল)-এর রাজনৈতিক প্রস্তাব নিয়ে তাঁর আলোচনার দাবি প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি হাওড়া জেলা কমিটির তরফে ১৮ দফা সমালোচনার দলিল পেশ করেন। সিপিআই(এমএল) থেকে বহিষ্কৃত হতে হয় তাঁকে। তখন তিনি মূলত হাওড়া জেলার কমরেডদের নিয়ে 'লিবারেশন ফ্রন্ট' সংগঠন তৈরি করে হাজারিবাগ জেলায় কাজ করতে থাকেন।

সিপিআই(এমএল) গঠিত হওয়ার সময় তিনি রচনা করেছিলেন *ভারতীয় বিপ্লব কোন পথে* (১৯৬৭) পুস্তিকাটি। মূর্তি ভাঙার লাইনের সমালোচনায় তিনি লেখেন *সাংস্কৃতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে : প্রসঙ্গ রামমোহন*। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় লেখেন *পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ* (১৯৭২)।

১৯৭৮ সালে স্তালিন জন্মশতবার্ষিকীতে তিনি লেখেন *The Stalin Question*, তারও আগে সিপিআই(এম) নেতৃত্বে বামফ্রন্টের ক্ষমতাদখলের সময় লেখেন, *শ্রেণীসংগ্রাম : পার্লামেন্টের ভেতরে না বাইরে*।

১৯৮৪ সালে আগ্রার এ পি শুক্লা, বালিয়ার কৃষক নেতা উমাশঙ্কর সিং-এর সঙ্গে মিলিতভাবে তিনি তৈরি করেন Marxist Leninist Group for Ideological Struggle (MLGIS)। এর আগে থেকেই তিনি যুক্ত ছিলেন 'ভারতীয় রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক সংঘ' (রেলের গ্যাংম্যানদের সংগঠন) ও 'উত্তরপ্রদেশ কিষাণ সংগ্রাম সমিতি'র সাথে। কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে বিভিন্ন শ্রমিক জমায়েতে ক্লাস নিতেন তিনি। স্তালিন জন্মবার্ষিকী উদযাপন কমিটি-র সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন ১৯৮৭ সাল থেকে।

এই পর্যায়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হলো *মার্কসবাদের সমস্যা* (১৯৮৮), 'সমাজতান্ত্রিক শিল্প-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে' (*রৌরব* পত্রিকার স্তালিন সংখ্যা), *নিঃস্তালিনীকরণের উৎস সন্ধানে* (১৯৯০) প্রভৃতি। তাঁর লেখার পরিধি ছিল বিস্ময়কর। একদিকে ১৯৬৬ সালে লিখছেন 'শেক্সপিয়ারের নাটকে কাঞ্চনমূল্য', অন্যদিকে ১৯৮৩-৮৪ সালে লিখছেন যজমান প্রথা ও এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর প্রবন্ধ। এমনকি সমরেশ বসুর সঙ্গে যৌথভাবে ষাটের দশকে 'অয়ন' সাহিত্য পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন।

আজ বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের সামনে মার্কসবাদী কর্মীরা যেরকম বিপর্যস্ত, খানিকটা দিশাহীন, সেসময়ে বনবিহারী চক্রবর্তীর জীবন ও রচনা শিক্ষণীয় হতে পারে।